বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬

এবং

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

এবং

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ

প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ এবং
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক : মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদক : মোঃ নজরুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগী : মুহম্মদ হিরুজ্জামান, উপ-সচিব
ইশরাত নাদিমা হাবীব, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
হোসাইন মোহাম্মদ এমরান, ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি
আফরোজা পারভীন কনা, সহকারী শিক্ষক

সহযোগিতায় : মোঃ সাবের হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ হানিফ পাঠান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

চিত্র সংগ্রহ : রবীন্দ্রনাথ রায়, জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ অঙ্কন : শঙ্কর কুমার দাশ, ইন্সট্রাক্টর (চারুকলা), পিটিআই, ময়মনসিংহ

বানান সমন্বয় : আবু ইকবাল বিপ্লব, বাংলা একাডেমি

প্রকাশনায় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ : এ্যাড গ্রো, ৪০/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৫৮৩১২৬৬৮, addgrow20@yahoo.com

A Souvenir of Bangabandhu Goldcup Primary School Football Tournament 2016 and Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib Goldcup Primary School Football Tournament 2016
Edited by Md. Nazrul Islam Khan, Additional Secretary
Published by Ministry of Primary and Mass Education, Bangladesh Secretariate, Dhaka.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩
০২ মার্চ ২০১৭

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মরণে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ টুর্নামেন্ট দুটিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। একটি অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত শিক্ষিত সমাজ গঠনে খেলাধুলাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার চিন্তা-চেতনাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁদের নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালুকরণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর মাধ্যমে আমাদের স্বাধিকার, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিণীর অবদান সম্পর্কে তরুণ প্রজন্ম জানতে পারবে এবং তাঁদের আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে।

খেলাধুলা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব তৈরির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। টুর্নামেন্টের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জিত হবে, তৈরি হবে জয় ও পরাজয় সহজে মেনে নেয়ার দুর্লভ মানসিকতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজকের শিশু-কিশোররা আগামীতে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় অবদান রাখবে। এ টুর্নামেন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে একঝাঁক উদীয়মান ফুটবলার, যারা ফুটবলকে এগিয়ে নেবে সোনালী ভবিষ্যতের দিকে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩
০২ মার্চ ২০১৭

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি টুর্নামেন্ট দুটিতে অংশগ্রহণকারী দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সবল মন। এজন্য খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের স্মরণে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলাধুলার জগতে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার নামে উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণে এ ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে ছিল। উপজেলাভিত্তিক এ টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ফুটবল অঙ্গনে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা জাতির পিতা এবং বঙ্গমাতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরো বেশি অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলবে। তাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে। এ টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে আগামীদিনের প্রতিভাধর ফুটবলার উঠে আসবে।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

দেশ ও মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতার ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের আদর্শে আগামী প্রজন্মের চরিত্র গঠনে এ টুর্নামেন্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট মেয়েদেরকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে প্রেরণা জোগাবে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে ভূমিকা রাখবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব শেখ মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩
০২ মার্চ ২০১৭

বাণী

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বঙ্গবন্ধু শেখ কামাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট" ও "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শেখ কামাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট" ২০১৬ আয়োজন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশের সৃজনশীল প্রয়াসকে আমি অভিনন্দন জানাই।

খেলাধুলার পাশাপাশি খেলাধুলার অংশগ্রহণ শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা করে। এছাড়া খেলাধুলা শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে। এই চিন্তা-চেতনা থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর প্রেরণাশক্তি সহধর্মিণীর নামে প্রবর্তন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ কামাল প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। এ টুর্নামেন্টের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জীবন ও জীবনভিত্তিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানবে, চর্চা করবে, বিশ্ব নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে এবং বিনির্মাণ করবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধীর মহীয়সী নারি। তাঁর অনুপ্রেরণা, সহনশীলতা ও দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা দেশমাতা বঙ্গবন্ধুকে মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে শক্তি জোগিয়েছে। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে একবিংশে শক্তিশালী সোনালী বাংলাদেশ গড়তে এদেশের মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নেবে– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বছর বঙ্গবন্ধু শেখ কামাল ফুটবল টুর্নামেন্টে ৬৪,২৯০টি বিদ্যালয়ের ১০,৯২,৪২০জন খেলোয়াড় এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শেখ কামাল ফুটবল টুর্নামেন্টে ৬৪,১৯৬টি বিদ্যালয়ের ১০,৯১,৩৩২জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে। এত বিপুল সংখ্যক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন বিশ্বে বিরল।

আমি টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং অংশগ্রহণকারী সকল ক্ষুদে খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। টুর্নামেন্ট আয়োজনকারী ও স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শুভেচ্ছান্তে,

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

সচিব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩

০২ মার্চ ২০১৭

বাণী

বছরের 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ২০১৬ উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। খুদে খেলোয়াড়দের ফুটবল নৈপুণ্য স্মৃতিময় করে রাখার জন্য স্মরণিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের যাত্রা শুরু ২০১০ সালে। এ টুর্নামেন্ট প্রাথমিক স্তর থেকে ফুটবল অনুশীলনের একটি বড় ধাপের আয়োজন। পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে মেয়েদের জন্য চালু করা হয় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ইতোমধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট দুটি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সুনাম কুড়িয়েছে বিদেশের মাটিতে। বাংলাদেশের প্রতিভা ফুটবলাররা জয় করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

এ বছর তৃণমূল থেকে উঠে আসা প্রতিটি বিদ্যালয়ের দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৭টি বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ দল জাতীয় পর্যায়ের খেলায় অংশ নিয়েছে। খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মাধ্যমে ১৪টি বিভাগীয় টিমের দুজন করে ২৮জন কোচকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচরাই ভবিষ্যতে খুদে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবে। এভাবে প্রতিভাবান খুদে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি হবে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়। এ আয়োজনের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য ফুটবল অনুশীলনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব, নেতৃত্বের গুণাবলী, শৃঙ্খলাবোধ, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার মানসিকতা তৈরি হবে।

আমি প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি বিজয়ীরা তাদের অসামান্য ফুটবল নৈপুণ্য এগিয়ে যাবে ফুটবলের বিশ্ব অঙ্গনে এবং সেই সাথে থেমে থাকবে না বিজিতদের জেতার লড়াই।

আমি বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই। এ উপলক্ষ্যে সৃজনশীল কাজে যারা সম্পৃক্ত তাঁরাও আমার ধন্যবাদার্হ।

মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান

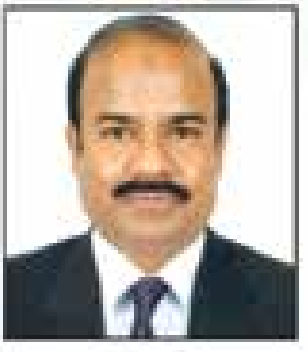

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩
০২ মার্চ ২০১৭

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষাকাল শিশুদের বহুমুখী বিকাশের স্তর। এ স্তরেই শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ শুরু হয়। শিক্ষার্থীর প্রফুল্ল, সবল ও সুন্দর স্বাস্থ্য, মনোবল বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরিতে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উপলব্ধি থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে ২০১০ সাল থেকে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এবং ২০১১ সাল থেকে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট'। এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ২০১৬।

টুর্নামেন্ট দুটির জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত খেলা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ হতে শুরু হয়ে ০২ মার্চ, ২০১৭ এ ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের আসর। এর পূর্বে ২০১৬ সালের মে মাসের মধ্যে ইউনিয়ন/পৌরসভা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ের খেলা এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা সম্পন্ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন/পৌরসভার বিদ্যালয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এ মোট ৩২,১৫০টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৪,২৬০টি এবং ১০,৯২,৪২০জন শিক্ষার্থী খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভার বিদ্যালয় পর্যায়ে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এ মোট ৩২,০৭৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৪,১৯৫টি এবং ১০,৯১,৩৩২জন শিক্ষার্থী খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে।

এ বছর মোট ১,২৮,৪৫৫টি টিমের মাধ্যমে ২১,৮৩,৭৫২জন শিক্ষার্থী খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৬৪,২২৮টি খেলা, যা বিশ্বের আর কোথাও কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। একারণেই প্রতিবছর এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তার স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান ও মেধাবী প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় খুঁজে বের করার কাজটি সুনিশ্চিত ও সহজতর হয়েছে। এ সকল খেলোয়াড়েরা ইতোমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে, এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও অভূতপূর্ব সাফল্যের সূচনা ঘটিয়েছে।

আমি 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ২০১৬ এর সাফল্য কামনা করি। যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়, ইউনিয়ন/পৌরসভা, উপজেলা/থানা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়সহ জাতীয় পর্যায়ের খেলা সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি

১৮ ফাল্গুন ১৪২৩
০২ মার্চ ২০১৭

সম্পাদকীয়

বাঙালির ফুটবল প্রীতি চিরায়ত। স্বাধীনতা-পূর্বকালে স্বাধীনবাংলা ফুটবল দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্বাধীনতার দূত হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে জাগরণ যাত্রা তৈরি হয়েছিল। সে সুবাদে ফুটবল অঙ্গনে বহু নামীদামী খেলোয়াড় মাঠে ঝড় তুলেছেন। ফুটবলের সেই প্রতিভা সন্ধানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও ২০১১ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করা হয়।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে টুর্নামেন্ট দুটোর বিস্তৃতি এখন সারাদেশে। বিশ লক্ষাধিক খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক বড় মাপের আয়োজন দিশে দিচ্ছে। বৃক্ষ যেমন প্রকৃতিকে তার ফুল-ফল, ছায়া-লতাপাতা সব উজাড় করে বিলিয়ে দেয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তেমন সর্বশক্তি দিয়ে ফুটবল সুরভি ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। তাদেরকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করার জন্য প্রতিবছর প্রতিযোগিতা দুটোর বর্ণিল আয়োজন এখন প্রথায় পরিণত হয়েছে। সেই প্রথার আঙ্গিনায় টুর্নামেন্টের মুহূর্তগুলো চিত্রিত করার জন্য স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের স্মরণিকায় বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে দু'জন নক্ষত্রের জীবনরেখা স্থান পেয়েছে। স্মরণিকার মূর্ত প্রতীক বিশিষ্ট প্রচ্ছদ এঁকেছেন শঙ্কর কুমার দাশ। প্রচ্ছদটি ফুটবল অঙ্গনে একটি নতুনমাত্রা যোগ করবে। কনটেন্ট নির্বাচনে বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। স্মরণিকায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও জীবনালেখ্যে উল্লিখিত প্রেরণাসঞ্চারী কথা-কথন, চিন্তা-চিন্তনে ভাবী খেলোয়াড়রা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় কনটেন্ট সীমিত রাখার জন্য সকলের লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি, সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এমপি বাণী দিয়ে প্রাণিত ও কৃতার্থ করেছেন। মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান এ উপলক্ষ্যে বাণীসহ এক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক উৎসাহ যোগিয়েছেন। তাঁদের সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে যাঁরা মন-প্রাণে সম্পৃক্ত এবং যাদের পরিশ্রম আর ত্যাগে সফলভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
অতিরিক্ত সচিব

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট: প্রতিভা অন্বেষণের আধার

মোঃ নজরুল ইসলাম খান

ছেটবেলার কথা খুব মনে পড়ে যখন দু'চারজন সহপাঠী জড়ো হলেই ফুটবল খেলা শুরু হয়ে যেতো। খড়ের বিড়া দিয়ে সেই খেলা। জাম্বুরা পেলে তো কথাই নেই। জাম্বুরা যৌবনে না যাওয়া পর্যন্ত আমার কেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে জাম্বুরার ফুটবল হরহামেশাই খেলতে দেখেছি। থানা পর্যায়ে ফুটবল খেলা হতো। সেই ফুটবলের মুখ খোলা ছিল। ভিতরে একটি ব্লাডার ছিল। ব্লাডার ফুলিয়ে মুখ জুতার ফিতার মতো বেঁধে দেওয়া হতো। বিড়া, জাম্বুরা ফুটবল নিয়ে চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি ও মারামারির অন্ত ছিল না। নিয়ম-কানুনের বালাই নেই, রেফারি ও লাইন্সম্যান শব্দের সঙ্গে পরিচিতি ছিল না বললেই চলে। মাধ্যমিক স্তরে আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা বছরে একবার হতো। ক্রীড়ামোদী কেউ থাকলে হয়তো পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ফুটবল খেলার আয়োজন হতো। খেলোয়াড়দের খালি পায়ে খেলতে দেখা যেতো। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে দু'চার জন নামী-দামী খেলোয়াড়ের নাম শুনা যেতো। তাদের নাম-দামের পিছনে ছিল ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। সত্তর দশকে ক্লাব ফুটবলের ঝলক দেখা গেছে। ক্লাব পর্যায়ে মুষ্টিমেয় খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ফুটবল শৈলী একধরণ স্ফুলিঙ্গটি জেগে ওঠে। আশি ও নব্বই দশকে ফুটবল মাঠে বেশ কিছু কৌশলী খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য দেখা যায়। তবে অনেকের ফুটবল শৈলীর স্থায়িত্ব ছিল খুবই কম।

ফুটবল খেলার শুরুটা খুব গোছানো ছিল এমন বলা যাবে না। অনেকের মতে ফুটবল খেলার জন্ম যুক্তরাজ্যে ১০৬৬ সালে, আরও আগে চীনে। ইংল্যান্ডের সমসাময়িক সময়ে ইতালিতে ফুটবল খেলার আবির্ভাব ঘটে। ইতালির খেলা সাজানো-গোছানো ছিল। উনিশ শতকের দিকে ইংল্যান্ডের এক স্কুল শিক্ষক রিচার্ড মুলকাস্টার ইতালিতে সাজানো-গোছানো খেলা দেখে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুলে তা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৮৭০ সালে মূলত আধুনিক ফুটবলের যাত্রা শুরু। বঙ্গদেশ বর্তমানে বাংলাদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা সবসময় তুঙ্গে ছিল। সমাজের বিকাশ-বিকাশে ফুটবলের উৎকর্ষ সাধন হয়নি। কারণ সহজ। চব্বিশ বছরে পাকিস্তানি শাসনে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। শোষণ ও বৈষম্যের কারণে প্রতিভা মাথা তুলতে পথ হারিয়েছে। যে দেশের গ্রাম-গঞ্জে আনাচে-কানাচে ফুটবল খেলার প্রতি এত অনুরাগ, সে দেশের প্রতিভার কমতি থাকে না। কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যারা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে উঠে এসেছে তাদেরকে লালন করার সুযোগ ছিল না। অনাদর, অযত্ন ও অবহেলায় প্রতিভা নিভে গেছে। তাই স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী জনবল তৈরি, তাদের মানসিক গুণাবলীর বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার স্ফুরণ ও সমাজ চেতনার বিকাশ মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধানে সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি জনবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই দৃষ্টান্ত এ কথাই জানান দেয় যে, শিক্ষার ভিত যেমন প্রাথমিক স্তরে রচিত হওয়া আবশ্যক তেমনি খেলাধুলার ভিতও প্রাথমিক স্তরে সূচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে যোগ্যতর করে তুলতে পারবে। ১৯১৭ সালে জগদানন্দ রায়ের নামে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অনুবাদ চর্চা' গ্রন্থটির একটি প্রসঙ্গ এখানে প্রণিধানযোগ্য। উক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবন সংগ্রামে অতীতকালে যেমন যোগ্যতমরাই টিকিয়া ছিল, আগামীকল্যও ঠিক সেইরূপই ঘটিবে'। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার এই ধারণা এখনও আমাদের জন্য একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন জাগে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য পাঠদানের পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রে কোথায় থেকে শুরু আর কোন পথে যেতে চাই? আগেই বলেছি ফুটবলের যাত্রা ১৮৭০ সাল থেকে। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বে ফুটবলের বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা যতটুকু বেড়েছে ততটুকু কোনকিছুই আমরা এগোতে পারিনি। কারণ অনেক। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই এ কারণে যে এ প্রতিযোগিতা বর্তমানে নিছক ক্রীড়া নয়, জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য এবং জীবন সংগ্রামে প্রস্তুতির এক অন্যতম বাহন। অবশ্য জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রশ্ন এলেই সর্বাগ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনের চিত্র ভাস্বর হয়ে ওঠে। স্কুল জীবন থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তানি শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করেছেন। খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন স্কুল জীবন থেকেই। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলায় ছিলেন সমান পারদর্শী। রাজনৈতিক খেয়াল এই সময় কম ছিল না। তবে সংগঠনের কাজে মুন্সিয়ানা ছাত্রজীবন থেকে লক্ষ করা গেছে। ছাত্রজীবনের সেই শিক্ষা রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সফল হয়েছেন, সফলতা এনেছেন। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখেছে কীভাবে তাঁর বজ্রকণ্ঠে আকাশ-বৃক্ষ-বনিতা আন্দোলিত হয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর ক্রীড়ানুরাগ, সাহস, সংগ্রামী চেতনা, মনোবল, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রবর্তিত হয়। এটি ছিল ফুটবল প্রতিভা অন্বেষণের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ।

সম্প্রতি ব্রাজিল সফরে দেখা গেছে দেশটিতে ফুটবলের উন্মাদনা অনেক বেশি। কিন্তু ফুটবল তো রয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে এত বড় আয়োজন সেখানে নেই। কিন্তু ক্লাব ফুটবল তো জমজমাট। সাওপাওলো, কুরিতিবা ও রিও শহরে নামী-দামী খেলোয়াড় এর প্রতিকৃতির দেখা যাবে দোকানের একটু পর পর। মারাকানা স্টেডিয়াম চত্বরে স্থাপিত ভাস্কর্য খচিত হয়েছে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক বেলিনি-এর মূর্তি। অন্যান্য খেলোয়াড়দের নাম খোদাই করা আছে। এটি নিঃসন্দেহে ফুটবল তারকা সৃষ্টির হাতছানি দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। আবাহনী মোহামেডান-এর খেলায় স্টেডিয়ামে যে উচ্ছ্বাস হতো সেটিকে জনসমুদ্র বলা যায়। তখন নামী-দামী খেলোয়াড়দের নাম মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। এখন প্রায়শই শোনা যায় ফুটবল মাঠে দর্শক কমে যাচ্ছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও নোবেল জয়ী রমাঁরোলাঁ'র একটি মন্তব্য এখানে মনে পড়ছে। অন্নদা শংকর রায় এবং মনীষা রায় ফ্রান্সে গিয়ে রমাঁরোলাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কবিতার পাঠক কমে যাচ্ছে কেন? উত্তরে রমাঁরোলাঁ বললেন এখনকার কবিতায় মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনা প্রতিফলিত হয় না। জীবনের ছোঁয়া থেকে থাকলে এমন অবস্থা হতো না। ফুটবল মাঠে দর্শক কেন কমে যাচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে তা সমাধানের জন্য জাতীয় ফুটবলের বিভিন্ন দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

জাতীয় ফুটবলের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, ফুটবলের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কাঠামো মন্ত্রণালয়ের নেই। তদুপরি জাতীয় ফুটবলে প্রতিভা যোগান দেওয়ার কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বললে অত্যুক্তি হবে না। পরিসংখ্যান দৃষ্টে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ ২০১০ সালে ৫৩,০৯৪টি বিদ্যালয়ের ৯,৫৩,৫৯৮জন, ২০১১ সালে ৬০,৭৭৫টি বিদ্যালয়ের ১০,৩৩,১৯২জন ২০১২ সালে ৬০,৮৭৮টি বিদ্যালয়ের ১০,৩৪,৯২৬জন, ২০১৩ সালে ৬২,২০৭টি বিদ্যালয়ের ১০,৫৭,৫১৯জন, ২০১৪ সালে ৬৩,৪১৪টি বিদ্যালয়ের ১০,৭৮,০৩৮জন, ২০১৫ সালে ৬৩,৫০৯টি বিদ্যালয়ের ১০,৭৯,৬৫৩জন এবং ২০১৬ সালে ৬৪,২৬০টি বিদ্যালয়ের ১০,৯২,৪২০জন শিক্ষার্থী বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। সেজন্য হয়তো বিদ্রোহী কবি বলেছেন, জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী, নারীই যুগে যুগে সঞ্চারী। পবিত্র কোরান-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, 'হুন্না লেবাসুল্লাকুম ওয়া আনতুম লেবাসুন লা হুন্না', অর্থাৎ নারীরা পুরুষের পরিচ্ছদ, পুরুষ নারীর পরিচ্ছদ (সূরা আল বাকারা)। সুতরাং নারী ও পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকে ২০১১ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। পরিসংখ্যান দৃষ্টে দেখা যায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-এ ২০১১ সালে ৫৭,৭১০টি বিদ্যালয়ের ১০,১৫,০৭০জন, ২০১২ সালে ৬০,৮০১টি বিদ্যালয়ের ১০,৩৪,৯২৬জন, ২০১৩ সালে ৬২,২৬১টি বিদ্যালয়ের ১০,৫৮,৪০৭জন, ২০১৪ সালে ৬২,৭০৪টি বিদ্যালয়ের ১০,৬৬,৪৭৮জন, ২০১৫ সালে ৬৩,৬০১টি বিদ্যালয়ের ১০,৭৮,৫২৭জন এবং ২০১৬ সালে ৬৪,১৯৫টি বিদ্যালয়ের ১০,৯১,৩০২জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। কোমলমতি শিক্ষার্থী যাদের পায়ে বল অচেনা ছিল, তারাই নিপুণভাবে বশে নিয়ে এসেছে ফুটবলকে। কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, 'এসো বন্ধু এগিয়ে চলি, হৃদয়ে বিশ্বাস রেখে বলি, পায়ে পায়ে স্বপ্নের সুতা, খুঁজে নিবো জীবনের ঠিকানা'।

প্রাথমিক শিক্ষা এখন আর পুথি-নির্ভর নয়। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসে আনন্দঘন পাঠদানের পাশাপাশি খেলাধুলায় মেতে উঠছে। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের ফুটবল শৈলীতে আলোকিত হচ্ছে এলাকাবাসী। খেলোয়াড়দের খেলায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ বছর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মাধ্যমে চৌষট্টি বিভাগীয় টিমের দুজন করে মোট ২৮ জন কোচের ফিজিশিয়ানের 'কোচ প্রশিক্ষণ' দেওয়া হয়েছে। এ কোচরাই ভবিষ্যতে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড়দের বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ফুটবল ফেডারেশনের সমন্বয়ে একটি টিম প্রতিটি জেলায় ভ্রমণ করে প্রতি দলের জন্য ২৫ জন খেলোয়াড় বাছাই করে দিবে। এতে টুর্নামেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলার আবহ তৈরি হবে। তাছাড়া টুর্নামেন্ট দুটির জন্য পুরস্কার ও প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি টুর্নামেন্ট ব্যবস্থাপনা নীতিমালা রয়েছে। সর্বোচ্চ গোলদাতার জন্য রয়েছে গোল্ডেন বুট। ইতোমধ্যে টুর্নামেন্ট দুটি দেশের সীমানা পেরিয়ে সৌরভ ছড়িয়েছে বিদেশের মাটিতে। কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মারিয়া, শামসুন্নাহার, তহুরা, শিউলি, সানজিদা, খাগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আনুচিং মগিনি, পালিতরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বন্না সহ আরো অনেক ক্ষুদে খেলোয়াড়ের নাম এখন মুখে মুখে। এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ব্রাজিলের মহিলা ফুটবল তারকা মার্তা, সুইডেনের কার্লি লয়েড বা জার্মানীর বোয়েরিজ'র মতো খেলোয়াড়। বলা বাহুল্য যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রতিভা অন্বেষণের জায়গা করে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ফুটবল পৌঁছে যাবে বিশ্ব আসরে– এই প্রত্যাশা সকল ফুটবল সুহৃদের।

লেখক : অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব : ইতিহাসের সাহসী মানুষ

সেলিনা হোসেন

মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা আমাদের জীবনে একজন অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের মানুষ। তিনি তাঁর সচেতনতা এবং নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় সময়কে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভিন্নমাত্রা লাভ করে নিঃসন্দেহে।

আজ ফিরে দেখতে চাইলাম আমাদের শিল্প-সাহিত্য, গবেষণা ইত্যাদি রচনায় তিনি কীভাবে উঠে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে বেশ কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন আমাদের প্রবীণ-নবীন লেখকেরা। যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে ব্যক্তি ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথা। সঙ্গে আছে রাজনীতির পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। যাঁরা পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনী লিখেছেন, কিন্তু তাঁকে দেখেননি, তাঁরাও তাঁকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করেছেন।

সাংবাদিক-লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখা 'স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব' প্রবন্ধে লিখেছেন : '৩২ নম্বরে এলে তিনি প্রায়ই চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেন। তিনি জানতেন আমি পেটুক। তাই বঙ্গবন্ধুর জন্য শুধু চা এলেও আমার জন্য সঙ্গে থাকতো তার হাতে বানানো পিঠা, বিস্কিট, কখনো একটু পুডিং বা এক টুকরো কেক'। একদিন ৩২ নম্বরের লাইব্রেরি কক্ষে বসেই বঙ্গবন্ধু তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'একজন নারী ইচ্ছে করলে আমার জীবনটা পাল্টে দিতে পারতেন।' আর জবাবে আমি বলেছিলাম, 'তিনি যদি আপনার জীবন পাল্টে দিতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসও সেদিন পাল্টে যেতো।' আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একদিন যেমন শেখ মুজিবের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে, তেমনি হবে মুজিবের পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেসারও। তাকে ছাড়া বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস হবে অসম্পূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন : 'আমার জীবনেও আমি দেখেছি যে, গুলির সামনে আমি এগিয়ে গেলেও কোনোদিন আমার স্ত্রী বাধা দেয় নাই। এমনও দেখেছি যে, অনেকবার আমার জীবনের ১০/১১ বছর আমি জেল খেটেছি। জীবনে কোনোদিন মুখ কালা কিংবা আমার উপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে বোধহয় জীবনে অনেক বাধা আমার আসত। অনেক সময় আমি দেখেছি যে, আমি যখন জেলে চলে গেছি আমি একআনা পয়সাও দিয়ে যেতে পারি নাই আমার ছেলেমেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তার দান যথেষ্ট রয়েছে।'

পরিবারের আর একজন সদস্য ড. ওয়াজেদ মিয়া। তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বামী। তাঁর বইয়ের নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ'।

অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল সময়। পরিস্থিতি থমথমে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের আলোচনা চলছে। ড. ওয়াজেদ মিয়া ২৫শে মার্চের দুপুরের কথা লিখেছেন : 'ওইদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু কারো সঙ্গে কথা না বলে গম্ভীরভাবে খাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, এতদিন ধরে যে আলাপ-আলোচনা করলে, তার ফলাফল কী হলো কিছু তো বলছ না। তবে বলে রাখি, তুমি যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সমঝোতা করো, তবে একদিকে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনী সুবিধামতো সময়ে তোমাকে হত্যা করবে, অন্যদিকে এদেশের জনগণও তোমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হবে। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু রাগান্বিত হয়ে শাশুড়িকে বলেন, আলোচনা এখনো চলছে, এই মুহূর্তে সবকিছু খুলে বলা সম্ভব না। এই পর্যায়ে শাশুড়ি রেগে গিয়ে নিজের খাবারে পানি ঢেলে দ্রুত ওপর তলায় চলে যান।'

এভাবে আমরা বুঝে যাই তিনি ইতিহাসের মানুষ। তিনি মানবচেতনার কণ্ঠস্বর। গণমানুষের পক্ষের শক্তি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে সঠিক অনুধাবনে নিজের করণীয় ঠিক রেখেছিলেন।

দেশের গবেষকরা মনে করেন ষাটের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের অবদান উল্লেখ করা অপরিহার্য। কিছুদিন আগে পড়েছিলাম গবেষক-প্রাবন্ধিক-রাজনীতিবিদ শেখর দত্তের বই 'ষাটের দশকের গণজাগরণ : ঘটনা প্রবাহ-পর্যালোচনা প্রভাব।' ৬৮৫ পৃষ্ঠার এই বইয়ের ১৭টি অধ্যায়ের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম '১৯৬৯ : গণঅভ্যুত্থানে উত্তেজিত পূর্ব বাংলা।' তিনি ষাটের দশকের রাজনীতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এক পর্যায়ে লিখেছেন 'সরকারি মহল এই দিনগুলোতে নানাভাবে প্রচার করছিল গোলটেবিলে যোগদান করলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি মেনে নেওয়া হবে।'

বলার অপেক্ষা রাখে না ফাঁসির আসামি হয়েও শেখ মুজিবের দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে ফজিলাতুন্নেছাকে এক ধরনের বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। এই সিদ্ধান্ত তাই জাতীয় ইতিহাসে সাহস ও দূরদর্শিতার উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ কথা প্রচলিত আছে যে, বেগম মুজিব নাকি শেখ মুজিবের সাথে দেখাশোনাতে সাক্ষাৎ করে প্যারোলে মুক্ত হয়ে গোলটেবিলে যোগ দিলে আত্মহত্যা করবেন বলে জেদ ধরেন। ফলে মুজিবের পক্ষে সিদ্ধান্তে অটল থাকা সহজ হয়। এ বিষয়ে 'সংগ্রামে আন্দোলনে গৌরবগাথায়' গ্রন্থে পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন,

"বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে তখন অনেকেই ছিলেন। ... আমরা, আমাদের পরিবার এবং আমার মা এ ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। অনেক কথা আমাদের শুনতে হয়েছে। কোনো এক নেতার কাছ থেকে আমাকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। আমাদের একজন বলেছিলেন, আমি তার নাম বলতে চাই না, নাম বলাটি সমীচীন হবে না, ইতিহাস কথা বলবে। ট্রেন রেডি, অনেক নেতা চলে গেছেন ক্যান্টনমেন্টের যে মেসে আব্বাকে রাখা হয়েছে সেখানে। সেখান থেকেই তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মা খবর পাবার সাথে সাথে আমাকে পাঠালেন যে, তুমি এখানে গিয়ে দাঁড়াও, যদি দেখা করতে পার। মা কিছু ম্যাসেজ দিয়েছিলেন সে ম্যাসেজটি যেন পৌঁছে দেই। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভেতরে যাবার আমার কোনো পারমিশন ছিল না। তবে আমাদের অনেক নেতা, অনেক বড় বড় আইনজীবী, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিকে সেখানে আমি দেখেছি। আব্বাকে বুঝাচ্ছিলেন যে, গাড়ি রেডি, ট্রেন রেডি, গেলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনেক চেষ্টা করে আব্বার সাথে দেখা করার সুযোগ পেলাম। আব্বা বেরিয়ে এলেন। গেটের বাইরে আসা তার সম্ভব না। তিনি গেটের ভেতরে আমি গেটের বাইরে। শুধু আমি মার ম্যাসেজটি তাকে পৌঁছালাম। হাতে একটি চিরকুট ছিল কিন্তু চিঠি দেবার সুযোগ ছিল না। আব্বা বললেন, চিঠি দেবার দরকার নেই, কী ম্যাসেজ বলে যাও। আমি আব্বাকে বললাম, "মা দেখা করার চেষ্টা করছেন। মার সাথে দেখা না করা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।" আমাদের সে নেতারা বুঝলেন যে, আমার মা কখনোই প্যারোলে যাবার পক্ষে ছিলেন না। আর আমার বাবা তো ছিলেনই না। তাই যারা চাচ্ছিলেন প্যারোলে নিতে তাদের প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হলো।"

এ বই একথাই প্রমাণ করে যে ষাটের দশকের রাজনৈতিক গবেষণায় ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ভূমিকা উল্লেখ না করলে ইতিহাসের সবটুকু সত্য বিবৃত করা হবে না। সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের তিনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। তাঁর নাম ইতিহাসে অপরিহার্য।

বাংলাদেশের সাহিত্যেও উঠে এসেছেন তিনি। কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক দুটো উপন্যাস লিখেছেন: 'যারা ভোর এনেছিল', আর 'ঊষার দুয়ারে'। বঙ্গবন্ধুর জীবনের পটভূমিতে লেখা এই দুই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের একজন ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। আনিসুল হকের 'জেনারেল ও নারীরা' উপন্যাসের একটি উদ্ধৃতি: "কিছুদিন আগে গুলিতে মারা গেছে ফারুক ইকবাল। আবুজর গিফারি কলেজের ছাত্র। মৌচাক-মালিবাগের মোড়ে তারা মিছিল করছিল। মুজিব শুনতে পেয়েছেন, মৃত্যুর আগে নিজের রক্ত দিয়ে এই ছাত্রটি রাজপথে লিখেছিল, 'জয় বাংলা'। মানুষ মরতে শিখেছে। এই মানুষকে কে দাবায়া রাখতে পারবে?
একটু পরে তাঁকে উঠতে হবে গাড়িতে। যেতে হবে রেসকোর্স ময়দানে। রেণু তাঁকে বললেন, 'মেলা রাত মিটিং করছ। সারাদিন একফোঁটাও ঘুমাতে পাওনি। এখন একটু বিশ্রাম নাও। ১০টা মিনিট শুয়ে থাকো।'
মুজিব রেণুর কথা শুনলেন। তিনি ১০টা মিনিটের জন্যই শরীর এলিয়ে দিলেন বিছানায়। পায়ের কাছে রেণু, মাথার কাছে হাসু।
বেগম মুজিব বললেন, 'শোনো, তোমার সামনে লাখ মানুষ, তাদের হাতে লাঠি। তোমার পেছনে বন্দুক। এই লাখ মানুষ যেন হতাশ না হয়। কারও পরামর্শ শোনার দরকার নাই। তোমার বিবেকের দিকে তাকাও। তোমার মন যা বলবে, তা-ই বলবা।'

মুজিব যেন ভেতর থেকে শক্তি পেলেন। তাঁর মন যা বলবে, তা-ই তিনি বলবেন। তিনি উঠে পড়লেন। বেগম মুজিব তাঁকে এগিয়ে দিলেন তাঁর সাদা পাঞ্জাবি, তাঁর কালো হাতকাটা কোট।

আমি যে উপন্যাসটি লিখেছি তার নাম 'আগস্টের একরাত'। এই উপন্যাসে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামির জবানবন্দী এক অধ্যায়ে দিয়েছি, অন্য অধ্যায়ে ওই রাতে পরিবারে কী হতে পারে তার কাহিনি বর্ণনা করেছি। বাস্তব ও কল্পনার মিশেলে এই উপন্যাস এক ক্রান্তিকালের চিত্র। একটি উদ্ধৃতি এমন: "একদিন তিনি আর রেণু টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে খাটে বসে গল্প করছিলেন। নিচে বসে খেলছিল হাসিনা আর কামাল। হাসিনা খেলা ছেড়ে মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে বাবার কোলে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে আব্বা, আব্বা বলে ডাকে। বাবা মেয়েকে আদর করে কপালে চুমু দেন। ছোট ভাইটি দেখেতে বসে দেখে। ওর লোভ হয় এইভাবে আদর পেতে। শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওর আর কিছু করার সাহস হয়নি।

একটু পরে হাসিনা খেলার জায়গায় ফিরে গেলে কামাল বলে, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা ডাকি?
রেণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হলে ছেলে তো বাবাকে ভুলবেই। বাবার আদর-সোহাগ কী জিনিস ছেলেটি বুঝতেই পারলো না।

বঙ্গবন্ধু ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আমি তো তোমারও আব্বা মানিক। ডাকো, তুমি আমাকে আব্বা ডাকো। কতবার ডাকতে পারো দেখি।

অন্যান্য সময় কামাল তাঁর কাছে আসতে চাইত না। সেদিন জড়িয়ে ধরা গলা আর ছাড়তে চায় না। ছোট্ট ছেলেটির আদর কাড়ার ব্যাকুলতা দেখে রেণুর চোখে পানি এসেছিল। ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, খোকাটার কাণ্ড দেখো। আহ রে আমার সোনা!

হাসিনা খলখলিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, আব্বার আদর পাওয়া যে কত মজার একদিনে তা আমার ছোট্ট ভাইটা বুঝতে পেরেছে। তারপর সুর করে বলেছিল, আদর নাও ময়না পাখি, আদর নাও। আদর নাও টিয়ে পাখি, আদর নাও। সব আদর মাথায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি যাও।

মেয়ের কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিলেন দুজনে। দুজনেই ভেবেছিলেন, ভাইয়ের অভিমান ঘুচিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি। ভাইবোনের সম্পর্কই এমন মধুর।

বঙ্গবন্ধু দৃষ্টি ঘুরিয়ে রেণুর দিকে তাকালেন। দূরে দাঁড়িয়ে দুজনেই বুঝলেন তারা একই কথাই ভাবছিলেন। এই মুহূর্তে ওদের দুই বোন কাছে নেই। তিন ভাই এই বাড়িতে আছে। একজন একেবারে নিথর হয়ে গেছে। দুইজন এই ঘরে অপেক্ষা করছে। রাত্রি অবসানের অপেক্ষা।

ঘরের সবার মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বঙ্গবন্ধু আবার রেণুর দিকে তাকালেন, তখনও তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভাবছিলেন বুঝি হয়তো স্বামীর কাছ থেকে কিছু শুনতে পাবেন। কিন্তু ঘরে তখন কোনো শব্দ নেই। বাতাসও নিস্তব্ধ হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু রেণুর দৃষ্টি দেখে অবাক হলেন। দৃষ্টি জলে ভেজা নয়। রেণু সাহসে-শক্তিতে দুর্জয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছর, রাজনীতিকে ভালোবেসে, মানুষকে ভালোবেসে। মানুষের জন্য ভালোবাসার ছায়া বিছিয়ে রেখে। বঙ্গবন্ধুর সবকিছুর সঙ্গে থেকেছেন ছায়ার মতো। বঙ্গবন্ধুর আকস্মিকভাবে মনে হয় আসলে রেণুর চোখে এখন প্রবল শূন্যতা। চোখে ভাষা নেই। ভালোবাসার হাহাকার তাকে ঘিরে আছে। চিরচেনা রেণু এখন এই ভয়াবহ মুহূর্তের অচেনা রেণু।

তিন বছর বয়সে বিয়ে হলেও আমাদের ফুলশয্যা হয়েছিল তোমার বারো বছর বয়সে, তোমার কি তা মনে আছে রেণু? আমি জানি সেই দিনের কথা তুমি ভুলবে না। আমাকে নিয়ে তোমার যা কিছু সঞ্চয় তা তোমার স্মৃতির সোনার কৌটায় জমা আছে। ... তখন সিঁড়ির আশপাশ দুটোর দিকে দাঁড়িয়ে উঠতে থাকে সেনা অফিসাররা। ওরা সিঁড়ির মাথা বরাবর উঠতে পারেনি। ওদের হাতে অস্ত্র।"
এই বাড়িতে এখন ভোর-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি অনন্তকাল। সময়ের থেমে থাকা প্রকৃতির সত্য নয়।
ইতিহাসের কালপর্বে সময়কে থামায় মানুষ। কারণ ইতিহাসকে কথা বলতে দেয়ার জন্য সময়কে থামতে হয়।
এই বাড়িতে এখন যা ঘটছে তা ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনা করবে ইতিহাসবিদরা। বলা যায় সময় নিজের প্রয়োজনে থামে। সময়কে থামতে হয়।
এই বাড়িতে সময় এখন থেমে আছে।
এই সময়ের মধ্যে ঘরে সবাই জড়ো হয়েছে।

দরজা আটকানো। রেণু যতক্ষণ পেরেছেন ছুটোছুটি করেছেন। করিডোর, ডাইনিং স্পেস, অন্যঘরে। দৌড়েছেন। উদভ্রান্ত সময় গড়িয়েছে। তার জীবনের সবচেয়ে উদভ্রান্ত সময়। মাথা সক্রিয় রেখেছেন। আর কি করতে হবে তা ভেবেছেন। কতটুকু করলে কতটুকু সম্পন্ন হয় সে ভাবনা তাঁর আছে।

এই সংসার তার জীবনের সবচেয়ে ধৈর্যের সময়। বড় বেশি শান্ত থাকার সময়। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করেছেন। ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন। আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করেছেন। জেলখানায় স্বামীকে খাবার পাঠিয়েছেন। দলের কর্মীদের সহযোগিতা করেছেন। স্বামীকে দেখবেন বলে ছেলেমেয়েসহ জেলখানায় গিয়েছেন। রাজবন্দি থাকাকালে স্বামীর মামলার খোঁজখবর নিয়েছেন। আর কি? রেণু এই মুহূর্তে হাঁটুর উপর থুতনি রাখেন। ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন না। ছেলেটি

এই বাড়ির সিঁড়িতলায় নিথর পড়ে আছে। কোথায় গুলি লেগেছে তাও তিনি নিজেকে সামলালেন। এই কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটি বিধবা হয়েছে তাকে বলার মতো আর কোনো কথা তাঁর ভাণ্ডারে নেই।

এমনই মানুষের জীবন। একসময় ভাষা ফুরিয়ে যায়। কর্ণ বধির হয়ে যায়। একসময় শরীর শীতল হয়ে যায়। একসময় রক্তের স্রোতে ডুবে যায়। এই মুহূর্তে এই বাড়িতে মৃত্যু এমনই নিদারুণ সত্য।

রেণু সবার মুখের দিকে তাকান। রেণু ঘরের চারপাশে তাকান। রেণু এই ঘরে দাঁড়িয়ে-বসে থাকা সবার নাম মনে করতে থাকেন। একসময় তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে থাকে টুঙ্গিপাড়ায় কাটানো তার শৈশব-কৈশোর, ভেসে থাকে সবুজ প্রকৃতি। ভেসে থাকে আশ্চর্য মধুর জীবন।

একটু পরে কি হবে তা রেণুর জানা নেই। একটা কিছু যে ঘটবে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কতটা ভয়াবহ হবে সে আশঙ্কা করতে পারেন না। হঠাৎ করে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। রাসেলের মুখের দিকে তাকান। এই শিশুর কিছু হবে না। ওতো এই পৃথিবীর নিরাপদ মানব-সন্তান। তিনি মনে মনে দোয়া পড়তে থাকেন। আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন করেন যেন সুস্থ থাকে পরিবারের সবাই।
মানুষের জীবনে সময় থেমে যাওয়ার এমনই নিয়ম।

২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে প্রাবন্ধিক-ফোকলোরবিদ শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত '৭ই মার্চের ভাষণ : একটি ফোকলোরিক আলোচনা'। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে। তিনি লিখেছেন: 'তাঁর চরিত্র শক্তিতে একই সঙ্গে মানবিক কুসুম-কোমলতা এবং কর্তব্য নিষ্ঠার ইস্পাত দৃঢ়তার সমন্বয় ঘটেছিল। তাই তাঁকে আমরা বলেছি কুসুমিত ইস্পাত।'

মাত্র সাতদিন আগে আমি একটি বই পেয়েছি। ইংরেজি ভাষায় লেখা এবং দিল্লি থেকে প্রকাশিত। লেখক সৈয়দ বদরুল আহসান। বইটির নাম: From Rebel to Founding Father : Sheikh Mujibur Rahman। তিনি এই বইয়ে ষাটের দশকের অবিস্মরণীয় সময়ে ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অবদানের কথা লিখেছেন। আমি দুটো লাইনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি- She passed on the message to Mujib... Mujib listened to his wife. He did not give any thought to freedom on parole any more.

এভাবে তিনি আমাদের সামনে উঠে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে হয়তো আরও লেখা আছে। এসব লেখায় তিনি শিশুসাহিত্যের পৃষ্ঠায় বেঁচে থাকবেন। থাকবেন শিশুর মুখের নান্দনিক কুশলতায়। থাকবেন ইতিহাসের গবেষণার মানুষ হয়ে।

তিনি উঠে এসেছেন গবেষণায় ও শিশু-সাহিত্যে। তাঁকে জানতেই হবে। কারণ ইতিহাসের পথের ধারে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে তিনি শক্ত পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে তো ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখতেই হবে। তিনি বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসের একজন।

লেখক : কথাসাহিত্যিক

কবিতা

বাঙালির অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান

রবীন্দ্র গোপ

আমার আকাশ জুড়ে আমার সাগর জুড়ে
আমার অনন্ত স্বপ্নের মাঝে যার নাম
হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে
লেখা আছে যে নাম,
যার নামে তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা আজও বহমান
অমর অক্ষয় সে নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে যার অঙ্গুলি হেলনে
জেগে উঠেছিল সাড়ে সাতকোটি বাঙালি প্রাণ,
যার নাম বাংলার সবুজ প্রান্তর জুড়ে।
আউল বাউল আর দোয়েল কোকিল
গেয়ে যায় মুক্তির গান,
তারই নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

যার নামে প্রগাঢ় আঁধার সরিয়ে
জেগে উঠেছিল ভোরের লাল সূর্য,
দিকে দিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে
বেজে উঠেছিল রণতূর্য,
তুমিতো সেই বীর যার নামে বিশ্ব বাঙালি
উঁচু করে দাঁড়ায় শির
বাঙালির গৌরবদীপ্ত সে নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফুলের স্নিগ্ধ মায়ায় আজও বসন্ত নামে ফাগুনে
বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ আজও তোমার নামে
জ্বলে উঠে বিপ্লবের আগুনে
তুমি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি-মহাসাগর, মহীয়ান
তোমার নামে মুক্তির মহামন্ত্রে
আজও গেয়ে যাই গান,
তুমি বাঙালির অপর নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

আজও গেয়ে যাই গান,
তুমি বাঙালির অপর নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

কবি : পরিচালক, লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন

শোভনের ইশকুল

রফিকুর রশীদ

শোভন আজ ইশকুলে যাবে। যাবে সে মায়ের সাথে। রিকশায়। আজই তার প্রথম যাওয়া। আগে কখনো যায়নি। বড় আপুকে যেতে দেখেছে। ইশকুলে যাবার যাবার আগে কী যে সুন্দর সাজে। আপুকে দেখে মনে হয় ফুলপরি।

শোভনও খুব সেজেছে। ইশকুলের জামা কাপড় আলাদা। জুতাও আলাদা। সব তার আলাদা চাই। ইশকুলের ব্যাগ, পানির বোতল সব কিছু নতুন চাই। সব নতুন।

ইশকুলের গেটে রূপমের সাথে দেখা। একই পাড়ার ছেলে। বয়সে একটু বড়। গতবছর থেকে সে ইশকুলে আসছে। শোভনের মা রূপমকে বলে, শোভনের দিকে খেয়াল রেখো বাবা।

বড় মানুষের মতো মাথা নেড়ে রূপম জানায়, আচ্ছা।

একসাথে বাড়ি এসো কেমন।

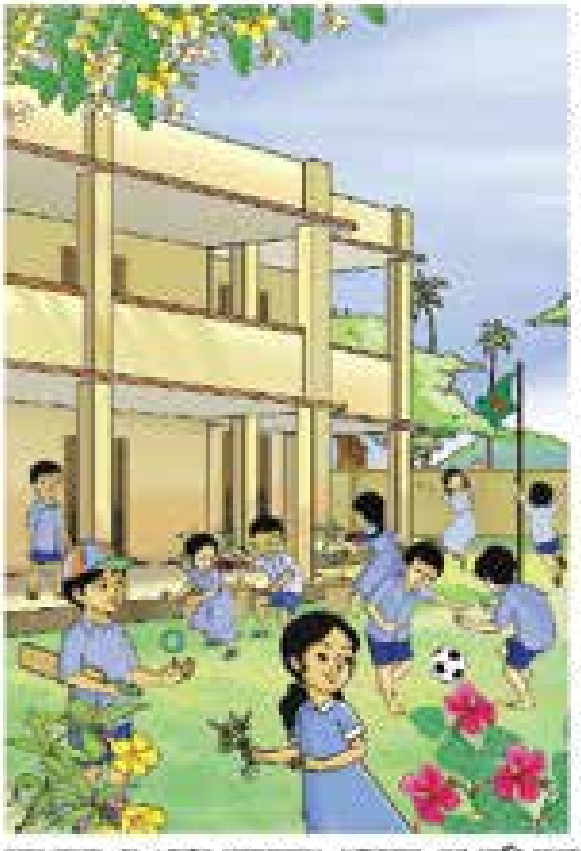

রূপম বলে,

আমি যে ইশকুল-ভ্যানে বাড়ি যাই।

শোভনকেও সাথে নিও তাহলে।

রূপম জানায়,

ঠিক আছে।

গেটের বাইরে থাকে মা। শোভন ঢোকে ভেতরে। পিছনে ফিরে তাকায়। মাকে আর দেখতে পায় না। তখন খুব মন খারাপ করে। রূপম হাত ধরে ডাকে, আয়।

শোভনের চোখ জ্বালা করে। দুফোঁটা পানি বেরিয়ে পড়ে চোখ দিয়ে। রূপম আবার বলে,

অ মা, কাঁদছিস কেন?

শোভন কাঁদে না। চুপচাপ।

রূপম ডাকে,

আয়, খেলা করি।

শোভন পা বাড়ায়।

ইশকুলের ভেতরটা খুব সুন্দর। বাইরে থেকে বুঝা যায় না। ভেতরে ঢুকলে ভালো লাগে। গাছের ছায়া। ফুলবাগান। খেলার মাঠ।

কত রকম যে খেলার আয়োজন! শোভনের তো ভারি মজার লেখাপড়া। খেলতে খেলতেই পড়া হয়। রূপমেরও তাই। বর্ণমালা শেখা। সংখ্যা চেনা। খেলার ছবি মেলানো। সবাই মিলে কবিতা বলা। এইসব নিয়েই লেখাপড়া। শোভনের বেশ ভালোই লাগে। আনন্দেই কেটে যায় ইশকুলের বেলা। শোভনের মন খারাপ হয় বাড়ি ফেরার সময়।

ছুটির পর রূপম সহজেই উঠে পড়ে ইশকুল-ভ্যানে। শোভনের ভালো লাগে না এই ভ্যানে উঠতে। ভ্যানটিকে তার মনে হয় খাঁচা।

চিড়িয়াখানায় সে দেখেছে বাঘের খাঁচা, সিংহের খাঁচা, পাখির খাঁচা। টিভির ছবিতে সে সাফারি পার্ক দেখেছে। সেখানে পশুপাখি থাকে খোলামেলা। আর মানুষ থাকে খাঁচার গাড়িতে। শোভন ভাবে– ইশকুলে কেন খাঁচার গাড়ি!

সে বাড়ি এসে মাকে বলে, আমাদের ইশকুল ভালো। তবু আমি আর ইশকুলে যাব না।
চমকে ওঠে মা– কেন? কেন?
ইশকুল-ভ্যান ভালো না।
কেন, ইশকুল-ভ্যানের কী দোষ?
এই খাঁচার গাড়ি আমার ভালো লাগে না।
ও, এই কথা?
আমরা কি পশুপাখি? আমরা কেন খাঁচায় ঢুকব মা?
শোভনের মা বলে,
তা ঠিক। দরকার নেই খাঁচায় ঢোকার। রিকশায় যাব। অথবা হেঁটে হেঁটে যাব।
ফিক করে হেসে ওঠে শোভন,
ঠিক আছে। তাহলে ইশকুলে যাব।
এ কথা শুনে শোভনের মা খুশি। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। শোভনের হাসিতে ঘর আলো হয়ে যায়।

লেখক : কথাসাহিত্যিক

শেখ কামালের গল্প শোনো

শিমুল সালাহ্‌উদ্দিন

বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে যে মানুষটির স্বপ্নের রূপ দাঁড়িয়ে আছে, একটি নতুন দেশের ক্রীড়াকাঠামো ও সংস্কৃতি অঙ্গন গড়ে তোলায় যার অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি শেখ কামাল। জন্মেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখবংশের সাধারণ এক পরিবারে। দিনটি ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় শেখ কামাল আশৈশব ছিলেন ডানপিটে, ছিলেন ব্যস্ত রাজনীতিক পিতার আদর-স্নেহবঞ্চিত।

তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন হয়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির মুক্তির দূত। পাকিস্তানী শোষকদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, প্রতিবাদী বক্তব্যের কারণে প্রায়ই থেকে যাচ্ছেন কারাগারে। এই গল্প বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ কামালের বড় বোন শেখ হাসিনার বক্তৃতা থেকে শোনা– বঙ্গবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছেন একবার, বহুদিন পর বাড়িতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, ছোট্ট শেখ কামাল এই আনন্দের হেতু বুঝতে পারছে না। বাড়িতে যে অপরিচিত লোকটি এসেছে, তাকে সে চিনতে পারছে না। আরও অবাক করার মত ব্যাপার হল, এই লোকটিকে তার বড় আপা শেখ হাসিনা আব্বা আব্বা বলে ডাকছে। বেশ কাচুমাচু ভঙ্গিতে ছেলেটি তার আপার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিলো, হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা ডাকি?

সেদিনের সেই অবুঝ কিশোর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল। কে ছিলেন তিনি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেয়ে "কি ছিলেন না তিনি" এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা সহজ। শৈশব থেকেই ডানপিটে কামাল সব ধরনের খেলাধুলায় প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। ঢাকার শাহীন স্কুলে থাকাকালীন ছিলেন স্কুলের প্রতিটি খেলার অপরিহার্য অংশ।

এরমধ্যে ক্রিকেটটাই তাকে টানত সবচেয়ে বেশি। দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার ছিলেন, নিখুঁত লাইন-লেংথ আর প্রচণ্ড গতি দিয়ে খুব সহজেই টালমাটাল করতে পারতেন প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানকে।

অবিভক্ত পাকিস্তানের অন্যতম উদীয়মান পেসার ছিলেন, কিন্তু একমাত্র বাঙালি হবার দোষে, রাজনীতিক শেখ মুজিবের পুত্র হবার অমার্জনীয় অপরাধে রুমেল, রকিবুলদের মত এই প্রতিভাও অবহেলিত, উপেক্ষিত হয়েছে নিদারুণভাবে সেই পাকিস্তান আমলে। আরেক ক্রিকেট অন্তপ্রাণ মুশতাকের দিন দিন পরিশ্রম আর চেষ্টায় গড়া আজাদ বয়েজ ক্লাব তখন শেখ কামালের মতো উঠতি প্রতিভাদের লালনকেন্দ্র। এখানেই শেখ কামাল প্রথম বিভাগ ক্রিকেট খেলেছেন দীর্ঘদিন। শুধু খেলাধুলাই না, পড়াশোনা, সঙ্গীতচর্চা, অভিনয়, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা থেকে শুরু করে বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরবার চেষ্টায় কোথায় নেই শেখ কামাল?

ঢাকার শাহীন স্কুল থেকে এসএসসি ও ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ভর্তি হলেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করলেন কর্মপরিধি। ছায়ানটের সেতারবাদন বিভাগের মেধাবী ছাত্র শেখ কামাল যুক্ত ছিলেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচক্র ও পরে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাথেও। সুঅভিনেতা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে সুনাম কুড়িয়েছেন তিনি। এদিকে খেলাধুলাও কিন্তু চলছে পুরোদমে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বাসিন্দা শেখ কামাল বাস্কেটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। বাস্কেটবলে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার হলের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল তার শিক্ষার্থী থাকাকালীন পুরোটা সময়। এর মধ্যে ৬৯ সালে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করে ধর্মীয় উগ্রতার পরিচয় দিয়ে। কিন্তু শেখ কামালকে কি আর দমানো যায়? বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার সন্তান তিনি, সেক্যুলার আর জাতীয়তাবোধের চেতনা তার ধমনীতে। তার প্রতিবাদের ভাষা হল রবীন্দ্র সংগীত, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে যেখানে যখনই সুযোগ পেলেন, তখনই বিশ্বকবির গান গেয়ে অহিংস প্রতিবাদের অসাধারণ উদাহরণ রেখেছেন শেখ কামাল।

২৫শে মার্চ ১৯৭১। পাকিস্তানী হানাদাররা সীমা ছাড়ালো। বন্দি হওয়ার আগেই সাইক্লোস্টাইল হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তখন নগর থেকে নগরে। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়া পড়লেন স্বাধীনতার ঘোষণা। পিতা শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানের কারাগারে, পুত্র শেখ কামাল তখন বাংলা মায়ের সম্ভ্রম রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধে। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে পালন করলেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নয় মাসের রক্তস্নাত পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল নতুন এক সার্বভৌম দেশ– বাংলাদেশ।

যুদ্ধে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশ পুনর্গঠনে পিতার অসামান্য সেবা আর অক্লান্ত কর্মক্ষমতা নিয়ে পিতার ডান হাত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শেখ কামাল। বন্ধু স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার তানভীর মাজহার তান্নার সাথে যুদ্ধের সময় প্রায়ই আলাপ হত শেখ কামালের। বারবার আক্ষেপ আর আশাবাদের মিশেলে বলতেন শেখ কামাল, তান্না, আমরা কি আর দেশে ফিরে যেতে পারব না? দেখে নিস, দেশ স্বাধীন হলে খেলার ছবিটাই বদলে দেব আমি।

কথা রেখেছিলেন কামাল। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরেই আবাহনী সমাজকল্যাণ সংঘ গড়ে ১৯৭২ সালে সংঘের নামে কেনা হল ইকবাল স্পোর্টিং ফুটবল দল। ক্রিকেট আর হকির দল কেনা হল ইস্পাহানী স্পোর্টিংয়েরটা। একইসাথে সমন্বয়ে নতুন যাত্রা শুরু হলো আবাহনী ক্রীড়া চক্র নামে একটি ক্লাবের। ক্রিকেটার তানভীর মাজহার তান্না হলেন এই ক্লাবের ফাউন্ডার ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি এই খেলাগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন কামাল। স্বপ্ন দেখতেন একদিন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। সে লক্ষ্যে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন সবক্ষেত্রেই, উপমহাদেশের মধ্যে প্রথমবারের মতো আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাল্টে দিয়েছিলেন সব খেলার খোলনলচে। ক্র্যাক প্লাটুনের বীর যোদ্ধা আবদুল হালিম খান জুয়েলের মতো অসাধারণ সব প্রতিভাগুলো যেন আর হারিয়ে না যায়, সেই লক্ষ্যে ক্রিকেটকে ঢেলে সাজানোর মাস্টারপ্ল্যান করেছিলেন কামাল। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে তৈরি করছিলেন নতুন দিনের জন্য, আগামী লক্ষ্য আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। স্বপ্ন কিন্তু এখানেই শেষ না, দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে সেটা বহুদূরে বিস্তৃত আর ফুটবলে তো রীতিমত বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন এই ভদ্রলোক। ক্রীড়াশৈলী আর আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয়ে রীতিমত তোলপাড় সৃষ্টি করলেন তিনি গোটা উপমহাদেশে। সেই ১৯৭৩ সালে আবাহনীর জন্য বিদেশী কোচ বিল হার্ট-কে এনে ফুটবল প্রেমিকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ক্লাব তো দূরের কথা, এই উপমহাদেশে জাতীয় দলের কোনো বিদেশী কোচ ছিলো না। আর তাইতো ১৯৭৪ সালে আবাহনী যখন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'আইএফএ' শীল্ড টুর্নামেন্ট খেলতে যায়, তখন আবাহনীর বিদেশি কোচ আর পশ্চিমা বেশভূষা দেখে সেখানকার কর্মকর্তা আর সমর্থকদের চোখ 'ছানা বড়া' হয়ে যায়! পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলা আবাহনী ক্রীড়াচক্র দর্শকদের অবাক মুগ্ধতা অর্জন করেছিল মাটি কামড়ে ছোট ছোট পাসে মাঠ জুড়ে চমৎকার ফুটবল দিয়ে। ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কমল বসু সহ আকাশবাণীর প্রথিতযশা ধারাভাষ্যকারবৃন্দ।

হকিতে নতুন দিনের সূচনা করেছিলেন কামাল। যোগ্যতা, দক্ষতা আর দেশপ্রেমের অসামান্য স্ফুরণে এই মানুষটি বদলে দিচ্ছিলেন সদ্য স্বাধীন একটি দেশের পুরো ক্রীড়াক্ষেত্র। শুধু ক্রীড়াই নয়, শিল্প-সাহিত্যের সব শাখা পুনর্গঠনে তিনি পালন করছিলেন অসামান্য অবদান। যারা এই দেশকে চায়নি, চায়নি স্বাধীনতা, এই উন্নতি, নতুন দিনের আগমন তাদের কেন সহ্য হবে? জাতির পিতা শেখ মুজিবকে অপবাদ দেবার মতো দুঃসাহস কিংবা বুকের পাটা কখনই হয়নি অন্ধকারের ঐ কুকুরগুলোর। তাই তারা বেছে নিয়েছিল তার সন্তানদের। যে শেখ কামাল ছিলেন খাঁটি মানুষ, কেউ কোনোদিন কোনো সাহায্যের জন্য তার কাছে এসে বিফল মনোরথে ফিরে গেছেন বলে তার শত্রুরাও কোনোদিন বলতে পারবে না, সেই শেখ

কামালের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ফাঁদলো একের পর এক সাজানো মিথ্যা বানোয়াট গল্প। যে গল্পের নিখুঁত পরিবেশনায় কোন খাদ ছিল না, অকল্পনীয় মিথ্যা দিয়ে বিশ্বাস যোগানো সে গল্প আজো বিশ্বাস করে এদেশের বিভ্রান্ত মানুষ।

বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭৫ সালের সেই ঘৃণ্য নরঘাতকদের হাতে জাতির পিতার সঙ্গে নিহত শেখ কামালকে ২০১১ সালের মরণোত্তর জাতীয় ক্রীড়াপদক প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কার প্রদানে কমিটি যে শুধু শেখ কামালকে সম্মানিত করেছেন তাই নয়, তারা সম্মানিত করেছেন পুরো বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতকে। কারণ শেখ কামাল সত্যিকার অর্থেই একজন প্রকৃত ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে তার অবদানের কথা নতুন প্রজন্ম এবং সাধারণ মহলের কাছে এখনও অব্যক্ত ও অজানা।

শেখ কামালের সহপাঠী, বন্ধু এবং বর্তমানে বাংলাদেশের একজন প্রথমসারির তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তফা জব্বার ২০১৬ সালের শোকের আগস্ট মাসে একটি দৈনিক পত্রিকায় এক নিবন্ধে শেখ কামালকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জাতির পিতার পুত্র হিসেবে নয়, বর্ণনা করেছেন একজন বহুমাত্রিক সাধারণ ক্রীড়াবিদ এবং একাত্তরের একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে।

ক্রীড়া সাংবাদিক মাহমুদ দুল তার একটি নিবন্ধে শেখ কামালের ক্রিকেটপ্রীতি, ফুটবলপ্রীতি, বাস্কেটবলপ্রীতি ইত্যাদির কথা খুব ভালভাবে তুলে ধরেছেন। এসব ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয় শেখ কামাল শুধু একজন ক্রীড়া সংগঠকই ছিলেন না, তিনি একজন খেলোয়াড়ও ছিলেন। শেখ কামাল জানতেন এবং মনে করতেন, খেলাধুলার মাধ্যমেই একদিন বাংলাদেশের পতাকা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের একটি ফুটবল দলকে তখন তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে তিনি ভারতে খেলতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিকেটের প্রতি তার অনুরাগের স্বীকৃতি হিসেবে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে সে সময়কার শেখ কামাল ব্যবহৃত তিনটি ক্রিকেট ব্যাট ও একটি ক্রিকেট বল সংরক্ষিত আছে। কয়েক বছর আগে ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী সেই জাদুঘর পরিদর্শনে এসে সেখানে তখনকার বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ ক্রিকেট সরঞ্জাম দেখে অভিভূত হন। খেলাধুলার প্রতি শেখ কামালের অনুরাগের আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ হলো সুলতানা খুকুকে সহধর্মিণী হিসেবে বেছে নেয়া। কারণ তখন সুলতানা খুকু দেশসেরা একজন মহিলা ক্রীড়াবিদ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য পুত্র হিসেবে তিনি মনে করতেন খেলাধুলার মাধ্যমে যুব সমাজকে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসবাদ, বিপথে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করা সম্ভব।

একদিকে তিনি নিজে ছেলেদের ক্রীড়ায় মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন, অপরদিকে সুলতানা খুকুকে দিয়ে মহিলা ক্রীড়াবিদ তৈরির জন্যই মূলত তিনি তাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাই তিনি ধানমন্ডি মাঠের একপাশে ছেলেদের এবং অপর পাশে মেয়েদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'আবাহনী ক্রীড়া চক্র' নামে একটি সফল ক্লাব গঠন করেছিলেন শেখ কামাল যা এখনও বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন তিনি ঘাতকের বুলেটের নির্মম আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর। কামাল বেঁচে থাকলে এখন বাংলাদেশের ক্রীড়া কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত তা সহজেই অনুমান করা যায়। আজ হয়তো বাংলাদেশের সাফল্যের ক্রীড়া ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। এখনও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন শেখ কামালের দেখানো পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের দরকার তাই আরো অনেক শেখ কামাল, শিল্প সংস্কৃতি ক্রীড়া ক্ষেত্রে যারা এই কিংবদন্তির মতোই নিজেকে অবদান রাখবে, আর সারাবিশ্বের বুকে সমুজ্জ্বল করবে বাংলাদেশের নাম।

লেখক : কবি, আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট এডিটর, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন।

দেশসেরা সুলতানা কামাল

আহমেদ রিয়াজ

পুব আকাশে সূর্যটা তখনও উঁকি মারেনি। হালকা রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে কেবল। বকশিবাজারের রেলগেট পেরিয়ে হাতের বামের রাস্তাটা চলে গেছে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দিকে। এখন যেটা বুয়েট হোস্টেল। রাস্তাটা সুনসান। এই ভোরে জগিং করতে নেমেছে কয়েকজন। সবাই ভাইবোন। ওদের বাবা নসির উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিদিন ভোরে ভাইবোন মিলে এই ভোরে বেরিয়ে পড়ে। তবে ছোটবোন খুকি কিন্তু শুধুমাত্র জগিংয়ের জন্য এত ভোরে বেরোয় না। বেরোয় ফুলের জন্য। নিরব এই রাস্তার দুপাশে অনেক ফুলগাছ। নানা রঙের ফুল ফুটে থাকে এসময়। সবাই জগিং করতে করতে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু ছোটবোনটা এগোয় ধীরে ধীরে। ফুল কুড়াতে কুড়াতে। আর এই ফুল কুড়াতে কুড়াতে খুকিই একদিন হয়ে ওঠে দেশ সেরা অ্যাথলেট।

পুরো নাম সুলতানা আহমেদ খুকি। জন্ম ১৯৫১ সালে ঢাকার বকশিবাজারে। ১৯৬৭ সালে মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন গভঃ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এখন এই কলেজের নাম বেগম বদরুন্নেসা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৯৬৯ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে। কিন্তু তার আগেই অ্যাথলেট হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই খুকি ছিলেন তুখোড় খেলোয়াড়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তৎকালীন পাকিস্তান অলিম্পিকে নতুন রেকর্ড গড়ে জিতেছিলেন স্বর্ণপদক। ১৯৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হার্ডলসে নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙেন। নতুন রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জেতেন।

স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিক্স আসর বসে ১৯৭৩ সালে। ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রথম আসরে মেয়েদের বিভাগে নয়টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো এককভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তিনটি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে অনন্য রেকর্ড গড়েন সুলতানা।

১০০ মিটার হার্ডলস, হাই জাম্প এবং লং জাম্পে প্রথম হন তিনি। এ ছাড়া ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নিয়ে হন দ্বিতীয়। দিনাজপুর জেলা একাদশের ফরিদা বেগম লিলি এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুফিয়া খাতুনকে পেছনে ফেলে হাইজাম্পে প্রথম হন। লংজাম্পে দিনাজপুর জেলা একাদশের শামীমা আরা মিনু এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মিস হামিদাকে পেছনে ফেলে প্রথম হন।

পরের বছর ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় লং জাম্পে দিনাজপুর জেলা একাদশের শামীমা আরা মিনু এবং সুফিয়াকে পেছনে ফেলে প্রথম হন সুলতানা আহমেদ। আর হাইজাম্পে দ্বিতীয় হন খুলনা জেলা একাদশের মেরিনা খানমের কাছে হেরে। এ বছর ১০০ মিটার হার্ডলসে অপ্রত্যাশিতভাবে কুমিল্লা জেলা একাদশের রোকেয়া বেগমের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে দ্বিতীয় হন।

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে। এই জাতীয় আসরই ছিল সুলতানা আহমেদের শেষ অংশগ্রহণ। এই আসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখান খুকি। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ১০০ মিটার হার্ডলসে ১৭.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে প্রথম হন। লংজাম্পে প্রথম হন বিটিএমসির শামীম আরা মিনু এবং কুমিল্লা জেলা একাদশের আনারকলিকে পেছনে ফেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর খুকু তার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় দল জাতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে একাধিক পদক জয় করতে সক্ষম হয়। সুলতানা আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ব্লু। ক্রীড়া জগতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ডাকসু তাঁকে বিশেষ পদকেও সম্মানিত করে। ১৯৭৩ সালে জাতীয় ক্রীড়ালেখক সমিতি কর্তৃক তিনি সেরা অ্যাথলেটও নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালে নিখিল ভারতে গ্রামীণ ক্রীড়ায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন খুকি। যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'বাঙালির মান রাখতে পারবি তো?' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছিলেন খুকি, 'পারব'। কথা রাখতে পেরেছিলেন তিনি।

সুলতানা আহমেদ এক অদ্বিতীয়া ক্রীড়াবিদ হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। আকর্ষণীয় চেহারার সাথে অ্যাথলেটিক্স সৌন্দর্য মিলিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রে দুটি উঁচু লড়াই, সাহস আর এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প। যে কারণে ১৯৭৩ সালে অ্যাথলেটিক্সে যে দাপট ছিল, পরের বছর সে দাপট মিলিয়ে পড়েছিল বেশ। কিন্তু ১৯৭৫ সালে আবার স্বমহিমায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনি।

এর কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামালের সঙ্গে বিয়ে হয় খুকির। আর তিনি হয়ে যান সুলতানা কামাল। আবাহনী নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেখ কামাল। তাঁর ইচ্ছে ছিল ছিল আবাহনী ক্লাবে একটি অ্যাথলেটিক্স টিম করবে। টিমের দেখভাল করবেন সুলতানা কামাল। ১৫ আগস্ট মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে স্ত্রী সুলতানাকে নিয়ে আবাহনী ক্লাবে গিয়েছিলেন তিনি। ম্যানেজার ও বন্ধুদের বলেছিলেন 'সুলতানাও এখানে বসবে'। কিন্তু ভোর রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত হন সুলতানা কামাল।

আর এখানেই নিভে যায় এক লড়াকু মানুষের জীবন প্রদীপ। কিন্তু সে আলোটা যে এখনও আছে, যারা দেখার, তারা ঠিকই দেখতে পায়।

লেখক : শিক্ষার্থীবৃন্দ

সিয়াম

নুরুল হক

শৈশব ও কৈশোরের মাঝামাঝি অবস্থানকারী এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলের নাম সিয়াম। জন্মের বেশ কয়েক বছর পরও তার শারীরিক কিংবা মানসিক কোন সমস্যা দেখা যায়নি। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে পাল্লা দিয়েই সে মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছে। সিয়ামের বাবা যথাসময়ে তাকে নিজেদের গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়। সেখানে সিয়ামের লেখাপড়া ভালোই চলছিল। শিশু সিয়াম বেশ কৃতিত্বের সাথে প্রথম শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠলো।

একদিন সন্ধ্যার পর সিয়ামের মা মিসেস মনোয়ারা সালেক সিয়ামকে পড়াতে গিয়ে লক্ষ করলেন, সে যাই মুখস্থ করছে ঠিক তার পর পরই ভুলে যাচ্ছে। বিষয়টি মিসেস সালেককে খুবই উদ্বিগ্ন করে তুললো। সালেক সাহেব ছুটিতে বাড়ি এলে রাতের খাবারের সময় মিসেস সালেক ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে পরামর্শ করলেন। মিস্টার সালেক পেশায় একজন পেশাদার মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে বেশ দক্ষতা ও সুনামের সাথে পুলিশে চাকুরি করে আসছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মধ্যবয়সী একজন পুলিশ কর্মকর্তা যে রকম মেজাজী হয় সালেক সাহেব তার ঠিক বিপরীত। গম্ভীর অথচ শান্ত। গায়ের বর্ণ কালো। পরোপকারী এ লোকটি পুলিশের অন্য সদস্যের মতো খুব একটা কঠোর স্বভাবেরও নয়।

থেকে থেকে স্ত্রী মনোয়ারার দিকে সন্দেহমূলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত প্রশ্ন করলেন। তা তুমি কি করে বুঝলে ছেলে সবকিছুই ভুলে যাচ্ছে? স্কুল থেকে কোন অভিযোগ এসেছে?

না, স্কুল থেকে এ ব্যাপারে কোন কথা আসেনি থ-থ বললেন মিসেস সালেক।
ছোট্ট এক টুকরো মাছ তুলে দিতে দিতে আবার সিয়ামের বাবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আমি বেশ কয়েকদিন যাবৎ ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। পড়াশুনার প্রতি তার মনোযোগ আগের মতো স্বাভাবিক থাকলেও একটি অক্ষরও সে মনে রাখতে পারছে না।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। সালেক সাহেব তার ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। মনে তার নানা ধরনের শঙ্কা। তিন মেয়ে দুই ছেলের মধ্যে সিয়াম সবার ছোট।

শহরের নামকরা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ মিসেস রোকসানা সালমা সিয়ামের মাথায় হাত বুলিয়ে পরম মমতার সাথে জিজ্ঞেস করলেন: কি নাম তোমার, বাবা?
-সিয়াম, সপ্রতিভ জবাব ছোট্ট বাবুর।
-বাবার নাম বলতে পারবে?
-জ্বী। আবদুস সালেক।
এটা সেটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন: কই, তেমন কোন সমস্যাতো দেখছিনা!
মিসেস মনোয়ারা বললেন: তাহলে সে কোন কিছুই মনে রাখতে পারছে না কেন?
সালেক সাহেবের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিটিস্ক্যান করা হলো। কিন্তু সেই পরীক্ষায়ও সিয়ামের কোন রোগ ধরা পড়লো না। অবশেষে সালেক সাহেব সিয়ামকে নিয়ে ফিরে গেলেন গ্রামে।

কিছুদিন পর সিয়ামের মানসিক অবস্থার ক্রমে অবনতি ঘটতে লাগলো। অপ্রয়োজনে কথা, ঘর থেকে কিছু না বলে বেরিয়ে যাওয়া একে একে বিনা কারণে মারধোর করা সিয়ামের দৈনন্দিন কাজের অংশ হয়ে দাঁড়ালো।

উপায়ন্তর না দেখে এক সময় পারিবারিক সিদ্ধান্তে সিয়ামের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সালেক সাহেব সিয়ামের চিকিৎসার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি রাখেননি। শেষমেশ স্ত্রী মনোয়ারাসহ সিয়ামকে নিয়ে রওনা দিলেন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসা শহর ভেলোরে। এ ব্যাপারে সালেক সাহেবকে যথাযথ সহায়তা দিতে এগিয়ে এলেন বেলাল। চট্টগ্রামের বায়েজীদ এলাকায় বাস করা সাবেক এক মেজর সাহেবের ছোট ছেলে বেলাল তার নিজ ছেলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষকে প্রদান করে কল্যাণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বছরখানেক আগে থেকেই। দূর-দূরান্ত থেকে অসহায় মানুষজন ছুটে আসেন বেলাল সাহেবের কাছে একটু পরামর্শের প্রত্যাশায়। তিনিও কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।
চিকিৎসার পিছনে দীর্ঘ একমাস সময় অতিবাহিত করে ভারত থেকে ফিরে এলেন সালেক সাহেব। সেখানকার ডাক্তারগণ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তারা সিয়ামের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ। এরপর টুকিটাক পানিপড়া থেকে ঝাড়ফুঁক

কোনটাই বাকী রাখেননি ছেলের আরোগ্য লাভে মিসেস মেহেরাবা। অবশেষে সবকিছু নিয়তির উপর ছেড়ে দিলেন।
নিয়াম এখন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী একজন শিশু। নিজের সাথেই নিজে কথা বলে। পাড়ার অন্য ছেলেরা তাকে খেলতে নেয় না। এমনকি তার সাথে কথাও বলে না। নিয়াম কখনো জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে অপলক দেখে থাকে কেমন করে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে নানারকম খেলাধুলা কিংবা খুনসুটিতে জড়িয়ে পড়ে।

তাদের বাড়ির পাশেই বিরাট মাঠ। বছরের পুরো সময় জুড়ে মাঠটি অনাবাদি পড়ে থাকে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই মাঠে প্রত্যহ বিকেলে খেলতে জড়ো হয়।
অন্যদিনের মতো আজও নিয়াম ঘরের পাশ ঘেঁষে বড় হওয়া আম গাছটির নিচে বসে আছে। তার বড় বোন মিশিকা বিকেলের নাস্তা খাওয়ার জন্য নিয়ামকে তাগিদ দিয়ে গেল। সে দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মন চাইলে কিছু খাবে। আর না হয় না খেয়েই আনমনে বসে থাকবে। হঠাৎ মিশিকা এসে নিয়ামের হাত ধরে বললো : চলো নিয়াম, খেলতে যাবে।

মিশিকা নিয়ামের সমবয়সী এবং একসাথেই তারা স্কুলে যেত। এখন সে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুল বন্ধ না হলে নিয়ামও এখন একই শ্রেণিতে পড়ত।
মিশিকা শিশু হলেও দ্রুত শারীরিকভাবে বেড়ে উঠার কারণে তাকে বেশ বড়সড় মনে হয়। বয়সের তুলনায় মিশিকা অনেক সুদর্শনী এবং মিষ্টি স্বভাবের।
নিয়াম বললো : না, তুমি যাও। ওরা আমাকে খেলতে দেবে না। আর আমিতো ওদের মতো স্বাভাবিক কেউ নই।
মিশিকা নিয়ামের কথা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি এসো।
আমরা একসাথেই খেলবো।
নিয়াম বললো : অবশেষে ওরা তোমাকেও বাদ দেবে খেলা থেকে। মিশি তুমি যাও। ওদের সাথে তুমিই খেলো।
মিশিকা দৃঢ়-চিত্তে নিয়ামকে আশ্বস্ত করলো এই বলে, প্রয়োজনে আমরা দুজনেই খেলবো নিয়াম। চলো।
মিশিকার পীড়াপীড়িতে নিয়াম মাঠে তার সাথেই মাঠে এলো।
কিন্তু বিপত্তি দেখা দিলো নিয়ামকে দেখার পর।
পাড়ার সব ছেলে একযোগে নিয়াম ও মিশিকাকে বয়কট করলো।
নিয়াম আর মিশিকা পরস্পরের বন্ধু...
তারা এখন নিজেরাই দুজনে মিলে একদিকে বসে গাছের নিচে মাদুর পেতে নানা খেলে। মিশিকা নিয়ামকে শিখিয়ে দিয়েছে কেমন করে দাবার চাল দিতে হয়। প্রতিদিন এসব খেলার বাহিরে তারা কম্পিউটারে বিভিন্ন গেইমস খেলতে পুরোদস্তুর অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
যে নিয়াম কয়েকমাস পূর্বেও নিজের নাম বলতে ভুলে যেতো আজ সে দাবার পাশাপাশি অন্যান্য খেলায় বুদ্ধিদীপ্ত মিশিকাকে হারিয়ে দিচ্ছে।
নিয়ামের ভেতর মিশিকা অন্য এক নিয়ামকে আবিষ্কার করলো।
এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।
মিশির বাসা থেকে নিয়ে আসা বইগুলো বিদ্যালয়ের পাঠ বুঝিয়ে দিয়ে আসা নিয়াম পড়তে পড়তে প্রথম থেকে শেষ অবধি যেন গিলে খেলো। নিয়ামের এমন পরিবর্তনের কথা তার পূর্বের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস জাহ্নবী রানী চট্টোপাধ্যায়। মিশিকার মাধ্যমে অবহিত হয়েছিলেন আরোও আগেই।
তিনি মিসেস মেহেরাবা আপাকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সকলের যৌথ সিদ্ধান্তে নিয়ামকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য বুকে টেনে নিলেন তার শিক্ষক ও সহপাঠীরা।
আর এবছরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রায় সবগুলো ইভেন্টে নিয়ামের একচ্ছত্র জয় যেন পৃথিবীর সকল প্রতিবন্ধীর জয় হিসেবে সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন।
এ কথা পুনরায় বলার অপেক্ষা রাখে না যে নিয়াম মিশিকার সাহচর্য পেয়ে একবারেই বদলে গেল। পৃথিবীর বিদ্যালয় থেকে বড় বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার মহোদয়গণ যা পারেননি মিশিকা একাই তা করলো।

লেখক : কবি ও কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধু : বাঙালি জাতির পথ প্রদর্শক মহান শিক্ষক

অধ্যাপক ড. মো: জাকারিয়া মিয়া

মহান ব্যক্তিত্ব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্মের ইতিহাস বাঙালির আত্মপরিচয়ের ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতিহাস। প্রত্যেকটি জাতির জন্য তার জাতীয় পরিচয়ের ইতিহাস জানা যেমন খুবই প্রয়োজন তেমনই বাঙালির গৌরবগাথা ইতিহাস জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য আমাদের জন্য ইতিহাস উপাখ্যান। বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের ঘটনাবলীর পুরোটাই বাঙালি জাতির স্বীকৃতি ও বাংলাদেশের সৃষ্টির অংশ। মোটকথা বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধ-বাংলাদেশ এক সূত্রে গাঁথা। তিনি শুধু একটি দেশ ও স্বাধীন ভূখণ্ডের রূপকারই নন, তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতায় বহু শিক্ষণীয় উপাদান সমাহার করেছেন যার চর্চাই আমাদের অগ্রযাত্রার পাথেয়। মানুষকে বুঝা, তাদের চাহিদাকে বুঝা, তাদেরকে সম্মান করা এ সবই ছিল বঙ্গবন্ধুর মৌলিক গুণাবলীর অংশবিশেষ। সাধারণ মানুষকে যেমন তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন তেমনি শিক্ষিত মহলকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এসব গুণাবলী ও আদর্শবাদীতার কারণেই তিনি আমাদের মহান অনুকরণীয় শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক। বঙ্গবন্ধুর জীবনের শিক্ষণ শিখতে গেলে সমকালীন ইতিহাসের বহু খণ্ড চর্চা করতে হবে। সীমাবদ্ধতার কারণে সংক্ষেপে তাঁর জীবন পাঠের অনুকরণীয় সামান্য অংশই এখানে বিধৃত হলো। বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের এই জনপদ সুপ্রাচীনকাল থেকেই সহজ সরল সাধারণ মানুষের জনপদ। তাদের সারল্য তাদেরকে অনেক গুণের অধিকারী করলেও তাদের অধিকার রক্ষায় তাউটি উপযোগী ছিল না। ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঔপনিবেশিক কাল থেকে এ ভূখণ্ডের বাঙালি জনগোষ্ঠী নানা ধরনের শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে কমবেশি সোচ্চার প্রতিক্রিয়া হয়েছে বটে কিন্তু তা কখনও অধিকার রক্ষায় আশানুরূপভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। ফলে নিকট ইতিহাসের ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বাংলার জনগণে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র পর তাঁদের অনুজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র সার্থক নেতা হিসেবে বাংলার জনগণের অধিকার আদায়, রক্ষা ও সুসংহত করতে পেরেছেন। জীবনের পরিক্রমায় নির্বিঘ্ন ছিল না জাতির পিতার। দুঃখী জনগণের জন্য অনবরত সংগ্রাম ও সঙ্কটের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখে নিরলস পরিশ্রম করেই তিনি জাতির পিতা হয়ে উঠেছেন।

রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি কাজের সফলতা দিয়ে যথাযথ স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। নিজের দৃঢ়চেতা সাহসী মনোভাবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার মত সুপরিকল্পিত চিন্তার আঁধার ছিলেন তিনি। নিজস্বতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে তাঁর কল্যাণমুখী চিন্তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপে অন্যদের শামিল করতেন নিজের সম্মোহনী কৌশল দিয়ে। সামনে থেকে সাহস যুগিয়ে অকুতোভয় এই নেতা কর্মী ও জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এগিয়ে নিতেন। তথাকথিত নিরুৎসাহী বিশেষজ্ঞদের মত পরামর্শ নেয়া তাঁর স্বভাব ছিল না। তিনি বরং প্রকৃত বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের থেকে তার সংগ্রামী পরিকল্পনায় প্রয়োজন মাফিক পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি নিজের লক্ষ্যমাত্রা নিজেই সৃষ্টি করতেন যার প্রমাণ তিনি বাল্যকাল থেকেই রেখেছেন। নিবেদিতপ্রাণ এই মহাপুরুষ জীবনের সিংহভাগ সময় ব্যয় করেছেন এদেশের জনগণের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যার ফলে তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থান পেয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তিনি জাতীয় নেতা থেকে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। তাঁর যোগসূত্র হয়েছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মহান নেতাসহ অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সাথে। বঙ্গবন্ধুর সামাজিক দর্শন ছিল গণচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্র গঠন। গণতন্ত্র কাকে বলে তা তিনি হাতে কলমে শিখিয়েছেন। আভিধানিক বা রাজনৈতিক সংজ্ঞা যাই হোক না কেন, নির্বাচিত ব্যক্তি লক্ষ্য অর্জনে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সচেতন মতামত প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হয়- এটি আমরা বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের সফলতা থেকে ধারণ করি। বঙ্গবন্ধু নিজস্ব দূরদর্শিতা দিয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন ও তা বাস্তবায়নে সবাইকে সংগঠিত করতেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানাই মুখ্য। বঙ্গবন্ধুর গুণাবলী, আদর্শ, একনিষ্ঠ সংগ্রামী চেতনা ছিল সুস্পষ্ট, যেটি ছিল শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত বাঙালির অধিকার প্রত্যাশার ভিত্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি রচনায় যত উপাদান প্রয়োজন তা তিনি জনগণের মাঝে সঞ্চারিত করেছিলেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় জনগণকে উজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৪৭ এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই অধিকারহারা বাঙালি তাদের উপর পাকিস্তানিদের শোষণ, বঞ্চনা, অধিকার হরণের মাত্রা পদে পদে অনুভব করেছিল। বঙ্গবন্ধুর কাজ ও চিন্তা বিমোহিত করেছিল এদেশের জনগণকে যার কারণে স্বাধীন জাতির অস্তিত্বের কল্পনা তারা করেছিল বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে। তারা বুঝেছিল জনগণের মুক্তির কাণ্ডারী সংগ্রামী নেতা

বঙ্গবন্ধুই তাদের একমাত্র পাথেয়। তাই তাঁকে অনুসরণ করে মুক্তির জন্য এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তৈরি লড়াকু জনতাকে নিয়ে অদম্য সাহসে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান। এজন্য তাঁকে বছরের পর বছর সহ্য করতে হয়েছে জেল-জুলুম-অত্যাচারসহ নানা নির্যাতন।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি শিক্ষা-শান্তি-প্রগতির স্লোগানে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, যা বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নিরলসভাবে বিরতিহীন সংগ্রামী জনতাকে চালিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার পতন দিবসকে স্মরণ রেখে ১৯৪৯ সালের এ দিনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল হয়। বহু ধাপে তাঁর সংগ্রামী চিন্তা বাস্তবায়নের প্রধান তিনটি পর্যায় লক্ষণীয় যেমন ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলন যার পরিপূর্ণতা হয় ১৯৭১ সালে। ১৯৪৮ এর ১১ মার্চ ভাষা দিবসে অবস্থান ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে তিনি ভাষা আন্দোলনে অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তা গুরুত্বপূর্ণভাবে অব্যাহত রাখেন। উপরন্তু, ঐদিন ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর পাকিস্তান বাহিনীর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করেন। ভাষা আন্দোলনের সফলতাই পরবর্তীকালে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল সমগ্র জাতিকে, যার নেতৃত্বের পুরোধা ছিলেন বঙ্গবন্ধুই। নেতৃত্বের কাতারে থেকে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে জয়যুক্ত করান। আন্দোলনের প্রচণ্ড চাপে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসকরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ও হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক প্রস্তাব হিসেবে ৬-দফা দাবি পেশ করেন। তখন পাকিস্তান সরকারের ব্যক্তিবর্গ ৬-দফাকে 'দেশদ্রোহিতার নামান্তর' ও 'বিপজ্জনক' বলে আখ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয় ২০ মার্চ ১৯৬৬ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হুমকি দিয়ে বলেন 'ছয় দফার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বাড়াবাড়ি করলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া হবে এবং দেশে গৃহযুদ্ধ হয়ে যাবে'। এমনই কঠিন পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা পেশ করার মাধ্যমে জনগণকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে স্বাধিকার আন্দোলনের সোপান হিসেবে খ্যাত ৬-দফা ও ছাত্র সমাজের ১১-দফা বাস্তবায়ন আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়িয়ে পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করলে ১৯৬৯ এ ছয়দফা বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে এদেশের ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান ঘটায় এবং স্বাধিকারের দাবী আরো জোরালো হয়। এই উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন স্লোগানে [আমি কে তুমি কে– বাঙালি, বাঙালি; পিন্ডি না ঢাকা– ঢাকা, ঢাকা; তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি] মুখরিত বাঙালির অধিকার আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর মুক্তির মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসের আলোচনায় বঙ্গবন্ধু বলেন– "এক সময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে .... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সাথে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই .... আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু "বাংলাদেশ"।" এটাই হলো বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতা।

১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন) পেয়েও শাসন ক্ষমতায় বসা তো দূরে থাক, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রোষানল থেকেই রেহাই পেল না। অবহেলা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যেভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করেছিল, ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় চিরদিনের জন্য পরাধীনতার জালে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। বাংলার জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে দরদ ও মমতার অনুভূতি তা তাঁকে বাঙালির অধিকার আন্দোলন থেকে একবিন্দু পিছপা করেনি। তিনি চিন্তায় অবিচল থেকে অদম্য সাহসে, শক্তিতে, বঞ্চিতের অধিকার ও বিক্ষুব্ধ সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকায় ছিলেন তেজোদীপ্ত বলীয়ান। জনগণকে দেয়া তাঁর ওয়াদা তিনি বরখেলাপ করেননি, আপস করেননি পাকিস্তানী বর্বর শাসক গোষ্ঠীর সাথে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের উত্তাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, পিলখানার ইপিআর (বর্তমান বিডিআর থেকে বিজিবি) হেডকোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। এ রাতেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানি হানাদার

বাহিনীকে প্রতিরোধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাত্রির অপারেশন সার্চ লাইটের নামে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক বাঙালি হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠনের মুখে জনগণকে ফেলে বঙ্গবন্ধু পালিয়ে যাননি। ঐ রাতেই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। মানুষের মাঝে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। তাই মুক্তিযুদ্ধের ৯টি মাস তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান করেই তাঁর নামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্ন পেশার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে নিয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, স্বাধীনতা বিরোধী ও তাদের লালন পালনকারী এদেশীয় একটি চক্র নতুন প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর এই অনুপস্থিতিকে ভুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। তাই উল্লেখ করা দরকার, এই সমস্ত বিভ্রান্তি ও ষড়যন্ত্র সৃষ্টিকারীদের জানা উচিৎ যে, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া যখন জার শাসনমুক্ত হলো তখন লেনিন ছিলেন জার্মানিতে, নেলসন ম্যান্ডেলার অনুসারীরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকাকে শ্বেতাঙ্গ শাসনমুক্ত করেছে তখন তিনি ছিলেন নির্জন রোবেন দ্বীপে বন্দি, কম্বোডিয়ার নেতা নরদম সিহানুক চীনে বসে তার দেশে মার্কিন বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, ইরানে রেজা শাহ'র পতনের সময় ইরানি বিপ্লবীদের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ছিলেন সুদূর প্যারিসে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাৎক্ষণিক বিশ্বসমাজের একাত্মতা এবং সহানুভূতি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত আর প্রায় আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাঙালির আজন্ম লালিত স্বপ্ন লাল-সবুজের পতাকায় স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বিশ্ব-মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায়সহ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে তিনি নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের তরফ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থা যেমন ওআইসি এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহের সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ ছিল তার কূটনৈতিক সফলতার অনন্য নিদর্শন। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অবকাঠামো, শিল্প-কারখানা স্থাপনসহ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পুনর্গঠনের বিপুল কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করেন। যে শিক্ষা দেশ জনগণকে কিছু দিতে পারে না, শুধু ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে ব্যবহৃত হয় তা মূল্যহীন। তাই জনগণের অর্থ ব্যয়ে সৃষ্ট শিক্ষিত সমাজকে বঙ্গবন্ধু জনগণের জন্য নিবেদিত হতে উপদেশ দিয়েছেন। শিক্ষার গুরুত্ব দিতে তিনি শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন। উন্নত জাতিসত্তা তৈরির জন্য স্বাধীনতার পরপরই তিনি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন এবং আপামর জনগণকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয় চালু করেন। প্রগতির চাকা পেছনের দিকে ঠেলে দিতে এবং ১৯৭১ এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের মদদে কিছু বিপথগামী ও ক্ষমতালোভী সেনা কর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মানুষ মানুষই, সমুদ্র সমুদ্রই; তবে কোন কোন মানুষ সমুদ্রও বটে, যদিও অনেকেই চেনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু সমুদ্রই নন, তিনি ছিলেন মহাসমুদ্রতুল্য। আমরা ক্ষুদ্রতুল্য ব্যক্তিরা তাঁকে কতখানি বর্ণিলভাবে তুলে ধরতে পেরেছি? কতখানি মূল্যায়ন করতে পেরেছি? নিঃসন্দেহে বলব, খুবই কম পেরেছি। কারণ অত বড় প্রসারিত হৃদয়ের মহাসমুদ্রকে মূল্যায়ন করার সামর্থ্য আমাদের পূর্ণ হয়নি যার কারণেই এদেশের কিছু কুলাঙ্গারতুল্য গোষ্ঠী দ্বারা ১৫ আগস্টের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে অকৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে আমাদের। আজ কথায় কথায় আমরা অনেকে বলে থাকি আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী, আমরা বঙ্গবন্ধু প্রেমিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো ক্ষমতার কালে কালে চলতে গিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্তুতির সাগর স্রোতে ভেসে গিয়ে সেই আদর্শ কী তা আমরা অনেকেই বলতে পারি না, শিখতেও পারি না ভাবিয়ে। বলতে দ্বিধা নেই, এটা আমাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতার অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা। আমরা যেন সঠিকভাবে ধারণ, লালন ও পালন করি বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সব সত্যকে।

সূত্র : প্রয়াত সাংবাদিক এ বি এম মুসা, প্রয়াত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর প্রয়াত জাতীয় নেতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক ও কিংবদন্তিতুল্য জননেতা তোফায়েল আহমেদ-এর লেখা থেকে এখানে তথ্য সংযোজিত হওয়ায় লেখক তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

লেখক : ডিন, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

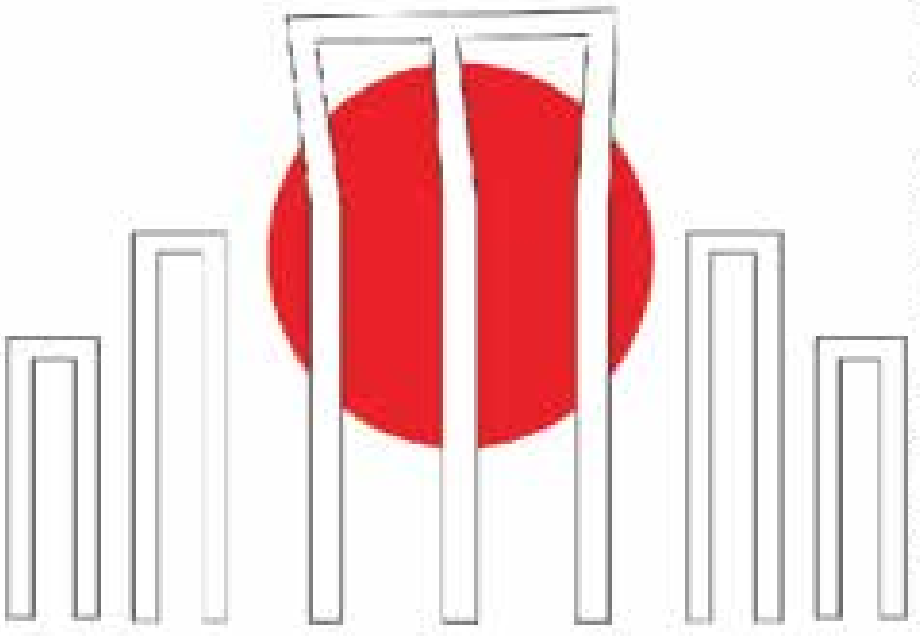

আমার ভাষা বাংলা ভাষা

জাকির আবু জাফর

বাতাস যখন পাতার সাথে গল্প করে যায়
শর্ষে ফুলে বর্ষে হাওয়া হলুদ নীরালায়
অবাক ভাষায় পাতায় ফুলে বাতাস বাজায় সুর
আমার ভাষা বাংলা ভাষা তারচে সুমধুর

ঢেউ খেলানো ধানের মাঠে উঠিকো মেঘের পাল
টুকরো ছায়ার ঘুণ্টি দৌড়ায় ছিঁড়ছে রোদের জাল
রৌদ্র ছায়ার পাশাপাশি সুখের ভাষায় হয়
আমার ভাষা বাংলা ভাষা তারচে মধুময়

প্রজাপতির পাখায় লেখা রূপের যাদুর নাম
রংধনু তার রঙের মেলা বসায় অবিরাম
দারুণ ভাষায় রঙের যাদু ভাবছি বসে তাই
কিন্তু আমার বাংলা ভাষা তার তুলনা নাই

আকাশ যখন নীল কালিতে নিজের কথা কয়
জোসনা সুখে শরীর ধুয়ে আঁধার করে জয়
নীলের ভাষা চাঁদের ভাষা দারুণ মায়াদার
আমার ভাষা বাংলা ভাষা তার যে চমৎকার।

কবি : দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক

গিনেস বুকে স্থান পেতে পারে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট

বাদল রায়

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামে দেশব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট বাংলাদেশে স্কুলে ফুটবলার তৈরির ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শুধু রাজধানী নয়, জেলা, উপজেলা এমনকি গ্রাম পর্যায়েও এই টুর্নামেন্ট এখন আলোচনার শীর্ষে। প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরিতে এটি একটি সঠিক ও সময়োপযোগী প্রজেক্ট বলে আমি মনে করি। এই প্রজেক্টে যুক্ত হয়েছে দেশের ৬৫ হাজার স্কুল। যার মধ্য থেকে প্রতিবছর ১০ লাখ ছেলে ও ১০ লাখ মেয়ে সরাসরি প্রতিযোগী হিসাবে অংশ নেয়। পৃথিবীর কোথাও খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে এমন বিশাল পদক্ষেপের কথা শোনা যায় নি। ফিফাও বলেছেন তাদের জানা মতে স্কুলে খেলোয়াড় তৈরিতে এত বড় কর্মসূচি বিশ্বের কোথাও নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, গিনেস বুকে স্থান পাওয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট। আমরা ফিফা একাধিকে বিষয়টি অবহিত করেছি। জানা গেছে, তারা এই বিষয়ে কাজ করছেন। আশা করি, আমাদের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশা শিগগিরই পূরণ হবে। আমি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ দিতে চাই এই জন্য যে, বিগত সাত বছর ধরে তারা এই কঠিন দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছে। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্কুলে খেলোয়াড় তৈরির কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। আমি মনে করি, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের সার্বিক সহযোগিতা না থাকলে এমন একটি সফল উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না।

বিগত কয়েক বছর যাবত স্কুল পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নামে দেশব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট গৌরব অর্জন করে চলেছে। এই টুর্নামেন্ট থেকে এসেছে প্রতিভাবান বহু ফুটবল খেলোয়াড়। একটা উদাহরণ দিই, ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুরের কথা। এই কলসিন্দুর থেকে উঠে এসেছে জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন প্রতিভা। এই মেয়েদের গৌরব গাঁথা ছড়িয়ে আছে সারাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাফুফে তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। শুধু কলসিন্দুর নয়, সারাদেশেই আমাদের এই প্রজেক্ট ছড়িয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা টুর্নামেন্ট আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য, ফুটবল যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যাক।

ফুটবল বাংলাদেশের ইতিহাসে লড়াই ও সংগ্রামের নাম। একসময় বাংলাদেশে ফুটবলের ব্যাপক উন্মাদনা ছিল। আমরা যখন খেলোয়াড় ছিলাম 'তখন' আর 'এখন' ব্যাপক পার্থক্য। এর কারণও রয়েছে। দীর্ঘদিন ফুটবল অবহেলিত ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও। বড় বড় ক্লাবগুলোর অভ্যন্তরীণ সমস্যাতো ছিলই। এখন পরিস্থিতি বদলেছে, প্রাণ ফিরে পেয়েছে ফুটবল। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ফুটবল। আগের মতো সব স্থানে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ২০১০ সালে এসএ গেমসে স্বর্ণ জয় করে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ফুটবল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফুটবল আজ তার হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায়।

॥ দুই ॥

বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন দক্ষ ফুটবলার ছিলেন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। চল্লিশের দশকে তরুণ শেখ মুজিব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের হয়ে ফুটবল মাঠ মাতিয়েছিলেন। তিনি খেলতেন স্ট্রাইকার পজিশনে। টানা আট বছর ক্লাবের হয়ে তিনি খেলেছেন। শুধু ফুটবল নয়, ওয়ান্ডারার্সের জার্সি গায়ে ভলিবল এবং হকিও খেলেছিলেন জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু কেবল খেলাধুলা ভালোবাসতেনই না, খেলাধুলায় উৎসাহও যোগাতেন। আজকের কলাবাগান মাঠ তাঁর অবদান। স্বাধীনতার আগে এই মাঠটি ছিল সিএন্ডবি ডিপো। এক সময় বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি পড়ে সেখানটিতে। তিনি ডিপো সরিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে কলাবাগান মাঠটি সংস্কার করেন। বঙ্গবন্ধুর ছেলেরা, শেখ কামাল ভাই, জামাল ভাই এই মাঠে মাঝে মধ্যে খেলতে আসতেন।

জাতির পিতা ফুটবলার ছিলেন কিন্তু অন্যান্য খেলাধুলায় তার আগ্রহ বা ভালোবাসার কমতি ছিল না। তিনি ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, দাবা, কাবাডি, ভলিবল, জুডো-কারাতেসহ সব ধরনের খেলাকে সমগুরুত্ব দিতেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের যাত্রাও জাতির পিতার হাত ধরে হয়েছিল। তাঁর অনুপ্রেরণা ও আন্তরিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে ফুটবল মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে মাঠে গড়ায়। প্রথম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। খেলা হয় বাংলাদেশ একাদশ ও রাষ্ট্রপতি একাদশের মধ্যে। ১৯৭২ সালে মে মাসে ঢাকায় খেলতে আসে কলকাতার মোহনবাগান। ঢাকা একাদশের সঙ্গে সেই খেলায় বঙ্গবন্ধু মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করেন। ক্রিকেটের প্রতিও তাঁর ছিল

অনেক অবদান। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গঠন করেন। একটি নতুন ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বর্তমানে যা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডি ক্লাবেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই পদে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির পিতার দেখানো পথকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামাল। কামাল ভাই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। খেলাধুলার বাইরে তিনি ছিলেন একজন গায়ক ও অভিনেতা। তবে কামাল ভাইয়ের খেলাধুলায় আগ্রহ ছিল অধিক। ফুটবল, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল তিন খেলায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। ফুটবল আনুষ্ঠানিকভাবে না খেললেও আবাহনীর হয়ে তিনি ক্রিকেট লীগ খেলেছেন। একজন স্পিনার হিসেবে কামাল ভাইয়ের খ্যাতি ছিল। কামাল ভাই বাস্কেটবল খেলেছেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের পক্ষে। ১৯৭৩ ও ৭৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে ওয়ান্ডারার্স বাস্কেটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। কামাল ভাইয়ের অধিনায়কত্বে ওয়ান্ডারার্স মহসীন স্মৃতি ট্রফি জয় করে। আজকের আবাহনী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামাল। তাকে বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের জনক বলা হয়। আমি মনে করি আজ শেখ কামাল বেঁচে থাকলে ফুটবলকে তিনি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন।

শেখ জামাল ছিলেন আজাদ বয়েজের হকি খেলোয়াড়। ফুটবলের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল। জামাল ভাই আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ (শেখ কামালের স্ত্রী) সুলতানা কামাল খুকু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অ্যাথলেটদের একজন ছিলেন। ১৯৭৩ সালে খুকু নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ায় বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেন। সেবার লংজাম্পে দ্বিতীয় হয়েছিলেন তিনি। ধানমন্ডিতে তার নামে সুলতানা কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্স রয়েছে।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের কালো অধ্যায়ের স্মৃতি এখন শেখ রাসেল। ১০ বছর বয়সী শিশু রাসেলের স্মৃতি ধারণ করে আছে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র। পাইওনিয়ার, তৃতীয় বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও প্রথম বিভাগ পার হয়ে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র এখন প্রিমিয়ার লীগে অন্যতম শক্তিশালী দল।

জাতির পিতার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা একনিষ্ঠ ক্রীড়ানুরাগী। শেখ হাসিনা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। তিনি এতটাই ক্রীড়ানুরাগী যে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের শত ব্যস্ততার পরও খেলার মাঠে ছুটে যান। উৎসাহ ও শক্তি যোগান দেশের ক্রীড়াবিদদের।

আসলে কোন পরিবারের কর্তা ব্যক্তি যদি ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ানুরাগী হন, তাহলে তার পরিবারের অন্য সদস্যরা যে সে পথেই হাঁটবেন সেটাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ক্ষেত্রে সেটাই বড় দৃষ্টান্ত।

॥ তিন ॥

পঁচাত্তর পরবর্তী সময়গুলো বাংলাদেশকে পাড়ি দিতে হয়েছে সামরিক জান্তা শাসকদের জলপাই আইনের আওতায়। শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংবাদপত্রই নয়, ক্রীড়াঙ্গনেও জান্তা শাসকের নিপীড়ন, নির্যাতনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ এবং সবকিছুতে নিয়ন্ত্রণ চালানো হয়। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াঙ্গনকে উন্নতির যে মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে জান্তারা পদ দখল করে তাদের ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সব কিছুতেই ছড়ি ঘুরাতো। তবে মানুষ ক্রমশ এদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। খেলোয়াড়রা স্বাধীনতা, দেশপ্রেম আর ক্রীড়াপ্রেমিক আচরণের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে। এর মধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুরু হয়। প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা বঙ্গবন্ধুর গড়া সংগঠন ছাত্রলীগের পাশে অবস্থান নেয়। ১৯৮০ সালের ডাকসু নির্বাচনে কাদের-চুন্নু পরিষদ থেকে ক্রীড়া সম্পাদক পদে আমি জয়ী হই। ওবায়দুল কাদের ভাই (বর্তমানে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও যোগাযোগমন্ত্রী) তখন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি। আমার প্যানেলে সাহিত্য

সম্পাদক পদে জয়ী হয় জাকির ওয়াহেদ। উল্লেখ করার মতো যে, আমাদের দুজনের জন্ম নারায়ণগঞ্জের ইমিগ্রেটগঞ্জে। এক সঙ্গে বেড়ে ওঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা এক সঙ্গে পড়ি। ডাকসুতেও দুজন ছিলাম। ১৯টি পদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ১৫টি পদ পায়। আমরা ১৫জন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বুকে কালো ব্যাজ এবং হাতে ফুল আমাদের দেখে শেখ হাসিনা মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন অন্যরকম পারিবারিক পরিবেশে আমরা নেত্রীর বক্তব্য শুনেছিলাম। সেদিনের সেই স্মৃতি সবসময় জাগরুক মনে। আবেগে এখনও মন সতেজ হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ডাকসুতে আমরা ১৫জন বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলাম। ডাকসুর এই বিজয় ছিল অন্যরকম বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব মেনে ওঁদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। যা আজ ইতিহাসের অংশ।

॥ চার ॥

ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন আর পিছিয়ে নেই, আমরা সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সঠিক পরিচালন দক্ষতা থাকলে খেলাধুলায় অনেক বড় সাফল্য সম্ভব, সেটির প্রমাণ দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর আন্তরিকতায় ক্রীড়াঙ্গন এখন শক্তিশালী। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম ছড়াচ্ছে। আজকে ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েরা যে সাফল্য দেখাচ্ছে তার রূপকারও শেখ হাসিনা। এই যাত্রা শুরু ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর। নারীর ক্ষমতায়নে ক্রীড়াঙ্গনও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সেটা শেখ হাসিনা উপলব্ধি করেন। সেই থেকে ফুটবল-ক্রিকেটসহ ক্রীড়াঙ্গনের কয়েকটি ইভেন্টে মেয়েদের পদচারণা। ২০০১ সালের বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের টুর্নামেন্ট নিয়ে দেখা দেয় অস্থিরতা। যশোরে মেয়েদের খেলায় বাধা দেয়া হয়। নেত্রকোণায় মেয়েদের মাঠেই নামতে দেওয়া হয়নি। এমনকি তৎকালীন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় থেকে আমাকে এক ধরনের হুমকি দেওয়া হয়। জানতে চাওয়া হয়, আমরা এসব কী করছি? তখন সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়া। অথচ তার আমলেই মেয়েদের খেলা বন্ধ করতে হয়। যা একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার কাছে কোনভাবেই প্রত্যাশিত ছিলো না।

যা হোক, সেই পরিস্থিতির অবসান হয়েছে। আজ মেয়েদের ক্রিকেট দল, ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে, মেয়েরা দেশে-বিদেশে সাফল্য দেখাচ্ছে শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে। এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে মেয়েদের বয়সভিত্তিক দল। বর্তমানে ফুটবলে ফিফা র‌্যাংকিং-এ বাংলাদেশের মেয়েরা একটা দৃঢ় অবস্থান করে নিয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের অনূর্ধ্ব-১৪ দলটি নেপালকে পরাজিত করে এএফসির আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হয়।

॥ পাঁচ ॥

খেলাধুলা কেবল শারীরিক কসরতই নয়, শরীর সুস্থ ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে এর ভূমিকা অপরিহার্য। সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণে এবং বিপথগামী তরুণদের সুপথে ফিরিয়ে আনতেও খেলাধুলার ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। সেই লক্ষ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে নানা ভূমিকা রাখছেন। সম্প্রতি প্রতিটি ফেডারেশনের উন্নয়নে তিনি ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন যা ইতিহাসে প্রথম। তা তৃণমূল থেকে খেলোয়াড় তৈরি করতে সহায়ক হবে। তিনি পাড়া-মহল্লায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাব-খেলার মাঠ গড়তে উদ্যোগ নিয়েছেন। সম্প্রতি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেক উপজেলায় সরকারি উদ্যোগে 'মিনি স্টেডিয়াম' নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমার মতে, এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার নামে দেশব্যাপী যে ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা এবং এই ধরনের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিভিন্ন বিভাগভিত্তিক টুর্নামেন্ট উপজেলা পর্যায় থেকে আয়োজন করা। এই ক্ষেত্রে বাফুফের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ক্লাবগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। এতে নতুন মেধাবী ও দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি ও বাছাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমি দীর্ঘদিন ধরে ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে একজন খেলোয়াড়। পরে দীর্ঘদিন যাবত সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সততা, দক্ষতা নিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে ফুটবলকে সমৃদ্ধ করতে। আমি বিশ্বাস করি এতে আমরা সফল হবো। কারণ, আমাদের প্রেরণার নাম শেখ হাসিনা। তিনি জাতির পিতার কন্যা, একটি ক্রীড়া পরিবারের সন্তান।

লেখক : বাফুফের সহ-সভাপতি, সাবেক ফুটবলার ও ডাকসুর সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক

ঝিকিরপুরের মেসি

নাসরীন মুস্তাফা

বাড়ি ফিরতেই চিৎকার করে ওঠে মাসুদা। বলে, আমাগো দল ফাইনাল।
দল? কিসের দল?
মা তার বাক্যকে থামকে প্রশ্নটি করতেই মাসুদার কথা আর থামে না। বলে, আমাদের ফুটবল দল মা। হেডমাস্টার স্যার আইজ নিজে খাইক্যা আমাগো দল ফাইনাল করছেন। আমি জানতাম, আমি কিছুতেই বাদ যামু না। পেরাকটিস ম্যাচ যে সবকটা হইছে, মা জান, আমি এক জোড়ার কম গোল করি নাই। পরতেক ম্যাচে গোল, তুমি জানতে পার মা?

মা জানতে পারেননি। হা করে তাকিয়ে আছেন তো আছেনই। মাসুদা ফুটবল খেলে, গোল দেয়, এসব কিছু তার মাথায় ঢুকছে না। কেননা এই পরিবারের কোন মেয়ে কখনো কোন খেলা খেলেনি। পুতুল খেলাও না। একেবারে ছোট বয়সে দড়ি লাফ চলে, একটু বড় হলে সেটাও না। মা খেলে না। সেই পরিবারের মেয়ে মাসুদা ফুটবল খেলে আর গোলও দেয়, এটা মায়ের কল্পনায় থাকার কথা নয়। ছিলও না। মাসুদা বলার পরও মা জানতে পারছিলেন না।

রানার খুব মজা লাগছিল। মাসুদার কথা মা'কে বসিয়ে দেবে, তার আভাস পেয়ে ওর মজা লাগছে। মাসুদার ফুটবল খেলার শখ মিটে যাবে, এমনটা ভাবতেই ও চায়। ছেলেদের দলে ওর জায়গা হয়নি। ফুটবল মাঠে কেন যেন একটু পরেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। অন্যের পা থেকে বল নিজের পায়ে নিতে কৌশল করতে হয়, স্যার কত বার যে ওকে শিখিয়েছেন, ওর মনে থাকে না। 'আমি বল চাইছি, তুই বল দিবি না ক্যান' থাকা রাগ জমে যায় মাথায়। তখন কৌশল-টৌশল ভুলে যায় রানা। কোন একটা মার দিয়ে বসে, ফাউল হয়ে যায়। ওর নাম হয়ে গেছে 'ফাউল রানা'।

মাসুদাকে সবাই ডাকছে 'ঝিকিরপুরের মেসি' নামে, রানার কানে গেছে সে নাম। মাসুদা নাকি মেসির মহিলা রূপ, মাসুদার মধ্যে মেসি আছে, কেউ কেউ বাড়িয়ে বলে যে মেসিও নাকি ফেইল মেরে যাবে মাসুদার কৌশলের কাছে। এই মেসিটা কে, তা ঝিকিরপুরের কেউ কেউ জানতো। মাসুদার কল্যাণে এখন মোটামুটিভাবে সবাই জানে। মেসি হচ্ছেন আর্জেন্টিনা দলের খেলোয়াড়। মেসির পায়ে জাদু আছে। শয়তান মাঠের মইধ্যে খাড়াইয়া থাকলেও মেসির গোল ঠেকাইতে পারে না। কেউ কেউ এমনভাবে বলে যেন সে নিজের চোখে দেখেছে, শয়তান মাঠে নেমে মেসিকে ঠেকাতে চাইছে। পারছে না।

রানা কতজনের মুখেই যে শুনেছে, সে 'ঝিকিরপুরের মেসির ভাই'। এরপর তো ওর মেজাজ আরও খারাপ হয়েছে। নিজে খেলবে, মাসুদার চেয়েও ভাল খেলে সবাইকে দেখিয়ে দেবে, এমন স্বপ্নই দেখেছিল ও। ফাউল রানা হয়ে গিয়ে ও যেহেতু খেলবে না, মাসুদাকেও খেলতে দেবে না। মা-এর ভাবনায় খোঁচা মেরে বলে, ফুটবল তো পোলাগো খেলা, না মা? মাসুদা কি পোলা? মাসুদা তো মাইয়া, না মা? মাইয়া হইয়া মাসুদা ক্যামনে ফুটবল খেলব? বাপজানে শুনলে রাগ করব, করব না মা? করব।

মা খুব ভার করে ফেলেন মুখ। মাসুদার চোখে পানির পুকুর দেখেও দেখেন না। রানার মুখের হাসিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারেন না। ওদিকে মাসুদা ফোঁস করে ওঠে। বলে, হেডমাস্টার স্যার কি তয় মিছা কথা কইছেন? তিনি কোনদিন মিছা কথা কইছেন, এমনটা কেউ কইতে পারব?
কি কইছেন তিনি?

তিনি কইছেন, এই যে মাইয়ারা, মন দিয়া শোন। আমাগো প্রধানমন্ত্রী কইছেন, মাইয়ারা পাঁচ-দশটা গোল দিবার পারে। প্রধানমন্ত্রী কইছেন? মা জানতে চান। মা কেন জানতে চাইছেন এতো কথা? রানা পানির গ্লাসটা জোরে শব্দ করে মাটিতে রেখে বলে, পোলারাও পারে।

মাসুদা জোরের সাথে বলে, পোলারা পারলে মাইয়াগো সমস্যা নাই। মাইয়ারা পারলে পোলাগোও কোন সমস্যা নাই। আমি পারতেছি, তুমিও পার ভাই। খেলার মাঠে ফাউল না দিয়া গোল দাও। আমার মতো জোড়া গোল দিবা, হাততালি তখন আমিও দিমু। আমি গোল দিলে তুমি দিবা না হাততালি? কও ভাই, দিবা না?
না দিমু না। তুই গোল দিলেও আমি হাততালি দিমু না। দিমু না। দিমু না।

রানা হাম হাম করে ভাত খেতে লাগল। শব্দ করে মুরগির হাড়ের মজ্জা চিবাতে লাগল। মাসুদার গলা দিয়ে খাবার নামছে না। ও ঢোঁক গিলে কান্না থামানোর চেষ্টা করছে। কেননা, এই নিষ্ঠুর ভাইয়ের সামনে ও কিছুতেই কাঁদবে না। ওকে খুব শক্ত থাকতে হবে। খুব শক্ত। মাসুদা স্বাভাবিকভাবে ভাত খেতে থাকে। একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ আটকে যায়। মা কেমন যেন উদাসী মানুষের মতো জানালা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন। কি ভাবছেন? মাসুদা কেন ফুটবল খেলবে, তা-ই ভাবছেন? এইসব ভাবাভাবি থামিয়ে দিতে মাসুদা বলে, হেডমাস্টার স্যার আমারে দলে নিছেন। এখন তেড়িবেড়ি করলে বেয়াদবি হইব। বেয়াদবি স্যারের কইলাম পছন্দ না। স্যারের খুব রাগ হইব। রাগের চোটে স্কুল থেইকা নাম কাটাইয়া দিলে গেল আমার পড়ালেখা।

রানা যেন খুশি হয় এই কথায়। বলে, তর পড়ালেখা গেলেই বা কি? মাইয়া মানুষের পড়ালেখা থাক না থাক কোনো ব্যাপার না। বাপজান তরে বিয়া দিয়া দিব।

ফিকফিক করে হাসে রানা। তবে মায়ের দিকে চোখ পড়তেই ওর হাসি বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের চোখে আগুন জ্বলছে। মুখটা কঠিন। মা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এইসব বাজে কথা তুই কোত্থেকে শিখছস্ রানা? সারাক্ষণ মাইয়ারা কি পারে না কইতেছিস্। মাইয়ারা কি পারে, সেইটা এখন ক'। ক' কইতাছি।

রানা বুঝে গেছে মা এখন রেগে গেছেন। সোজা কথা না বললে আজ ওর খবর আছে। আর তাই রানা চট্ জলদি বলতে থাকে, মাইয়ারা ভাই মায়ের মতুন রানতে পারে, তুমি যেমুন রান্দ।
আর?
রানা এরপর যা যা বলে, তার সবই মায়ের কাজ। মাইয়ারা ওর মায়ের মতো যা যা করতে পারে, তা বলে। মায়ের চোখের আগুন তখনো জ্বলছে দেখে মনে করতে হয় শেফালি আপার কথা। ওদের স্কুলের অনেকের যে কজন শিক্ষক আছেন, তাদের মধ্যে শেফালি আপা সেরা। শেফালি আপার ক্লাসে সবচেয়ে ভালোভাবে অংক বোঝে রানা। রানা বলে, মাইয়ারা অংক পারে। মাইয়ারা ফুটবল খেলা শেখাইতে পারে।

বলতেই হয় এ কথা যে মেয়েরা ফুটবল খেলা শেখাতেও পারে। কেননা, শেফালি আপা এখন ফুটবল খেলা শেখাতে শুরু করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা এতো সহজে ঘটেনি। ঘটনাটা ঘটেছে হাসমত স্যারের কারণে।

ওদের স্কুলের খেলাধুলার স্যার যে হাসমত স্যার, তিনি ছেলেদেরকে ফুটবল-ক্রিকেট খেলতে দিয়ে মেয়েদেরকে বলতেন, এই মাইয়ারা, তোমরা খাতায় মাঠ আঁক। মাঠে পোলারা ফুটবল খেলতাছে। মাঠের পাশে ফুল গাছ আঁকবা, মাঠের উপরে যে আকাশ, সেইখানে পাখি উড়াইয়া দিবা। মনে থাকব?

এই মাসুদাকেই একবার কান ধরে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, মনে আছে রানার। কেননা মাসুদা স্যারকে বলেছিল, আমরা খালি মাঠ আঁকুম, মাঠে খেলুম না? আমরা ক্যান্ মাঠে নাইমা ফুটবল খেলুম না, স্যার?

হাসমত স্যার চিবিয়ে চিবিয়ে যা বলেছিলেন এবং এখনো যা বলেন, তা মনে আছে রানার। অ রে মাসুদা! তুই কি পোলা? তুই তো মাইয়া, তুই মাইয়া না? মাইয়া হইয়া তুই ক্যামনে ফুটবল খেলবি?

শেফালি আপা মাসুদা আর মাসুদার মতো ফুটবল খেলতে চাওয়া মেয়েগুলোর পাশে দাঁড়ালেন। হেডমাস্টার স্যারকে বোঝালেন, মেয়েদেরকে ফুটবল খেলতে দিতে হবে। হাসমত স্যার না পারলে ক্লাস শেষে তিনি নিজেই ওদেরকে ফুটবল খেলতে শেখাবেন। স্কুলে পড়ার সময় তিনি নাকি ফুটবল খেলতেন।

শেফালি আপা যে কত ভাল খেলেন, তা বোঝা গেছে মাঠে নামার পরই। শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে গোল পোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে শেফালি আপা, আর সারা স্কুলের ছেলেমেয়ে-শিক্ষক তো বটেই, আশেপাশের সব মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে মাঠের চারপাশে। শেফালি আপা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, দেখি তো কে কয়টা গোল দিতে পারিস!

হাসমত স্যারই এগিয়ে গেলেন সবার আগে। যেতে যেতে বলছিলেন, এমন গোল দেব না, সূর্যে পাঠাইয়া দিব বল!

হাসমত স্যার সূর্যে বল পাঠাতে পারেননি, গোলপোস্টেও না। তার গোল খুব সহজে হাতের ভেতর আটকে দিলেন শেফালি আপা। বললেন, জান না যে এ্যাঙ্গেলে মারলেন, সে এ্যাঙ্গেলে গোল হয় না। কোন্ এ্যাঙ্গেলে গোল হয়, তা আমি আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারব স্যার। খুব সোজা অংক। ত্রিকোণমিতির ফর্মুলায় খেললেই দেখবেন পানির মতো সোজা হয়ে গেছে। এতক্ষণ শেফালি আপার কথা বলতে বলতে মাসুদার কথায় গিয়ে পড়তেই হুঁশ হয় রানার। যা বলতে চাইছিল বলতে হুঁশ, সেদিন একমাত্র মাসুদার করা গোলই শেফালি আপা ঠেকাতে পারেননি। কেউ যখন গোল করতে পারছিল না, তখন হেডমাস্টার স্যার নিজেও এগিয়ে এসেছিলেন। তিনিও পারেননি শেফালি আপাকে হারাতে। মাসুদা পেরেছিল। রানা বলতে

বলতে বলে ফেলে, কীভাবে মাসুদার গোল শেফালি আপাকে বোকা বানিয়ে গোলপোস্টে ঢুকে পড়েছিল। বলতে বলতে রানার বুকটা ফুলে গেল গর্বে, মনে মনে টের পেল, পিঠিরপুরের মেসির ভাই হতে পেরে ও কত খুশি।

মা মুচকি হেসে বলেন, তাইলে তো মাসুদারে বাদ দিয়া দল গঠন ঠিক হইব না। দল হারব। তখন ইশকুলের মানসম্মান যাইব। মাসুদা হুড়মুড় করে চেঁচিয়ে উঠলে মা থামিয়ে দেন। বলেন, বাপজানরে আগে কও। হারা বাড়ি রইলে না তুমি গোল দিবা। বাপজান আসবেন রাতে। ততক্ষণ মাসুদার পায়ের বল উঠানময় গড়ায়। পোরাকটিস চলতাছে, মাসুদা যেমনই বলল। একা একা খালি খাটতে পারেনি, কেননা রানার পা নিশপিশ করেছে। উঠানে নেমে গেছে ও-ও। দুই ভাইবোন বল কেড়ে নেওয়ার খেলা খেলেছে। মাসুদার সাথে খেলতে খেলতে রানা টের পায়, এইসব কায়দা-কানুন এর আগে শিখতে পারেনি ও। আর তাই তো খেলার মাঠে মাথা গরম হয়ে যেত। আরও আগে থেকে মাসুদার সাথে খেললে ওর নাম ফাউল রানা হ'ত না, রানার একরকমই মনে হতে থাকে।

বাপজান বাড়ি আসতে আসতে তবে এনেছিলেন দারুণ এক ফুটবল টুর্নামেন্টের খবর। পোরাইমারি ইশকুলের মাইয়াগো লিগা ফুটবল টুর্নামেন্ট। বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। ছয়-সাত বছর ধইরা এই টুর্নামেন্ট চলতে লেগে, পিঠিরপুর স্কুল এইবার অংশ নেবে। স্কুলের টিম নাকি দারুণ শক্তিশালী। স্কুলের মেয়েদের টিমে নাকি মাসুদা নামের এক মেয়ে আছে। সেই মাসুদা নাকি মাঠে নেমেই গোল করে। মাসুদা নামের মেয়েটির পা নাকি আল্লাহতালা বানিয়েছেন গোল দেওয়ার জন্যই। আর সে কী গোল! মাসুদা নাকি বলকে সূর্যে পাঠিয়ে দেয়।

বাপজান বাড়ি আসতে আসতে ভাবছিলেন, তার মেয়েটির নামও মাসুদা। বাড়ি ফিরে শুনলেন, সবাই যে মাসুদার কথা বলছিল, সে মাসুদা তারই মেয়ে মাসুদা। বাপজান মাসুদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে লম্বা একটা শ্বাস নিলেন। তার চোখের কোণে পানি জমেছে, তা বাচ্চাকাচ্চাদের টের পেতে দেওয়া যাবে না। আর তাই লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে পানি ঠেকাতে হ'ল। তবে এর পরের বেশ কয়েকটা দিন যা গেল, বাপজান নিজেও মাসুদার পোরাকটিস দেখতে দেখতে চোখের পানি কতবার যে সবার সামনে ঝরিয়ে ফেলেছেন, তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

রানা খুব অবাক হয়ে ভাবে, এর চারপাশের বড় মানুষগুলো আগে যেমন বলতো, মাইয়াগো পড়ালেহা বাদবাকি কোন বিষয় না। মাইয়াগো সুযোগ বুঝিয়া ফুল ফুটাইয়া দিয়া দেখন যায়।

এর চারপাশের বড় মানুষগুলো এখন আর একথা বলছে না। মাসুদা কোন্ ম্যাচে কয়টা গোল দিয়েছে, সে হিসাব এখন চারপাশে। মাসুদা গোল দিয়েছে, মাসুদার গোলে সব কটা ম্যাচ ওরা জিতেছে। মাসুদার গোল পিঠিরপুর স্কুলের মেয়েদের টিমটাকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে এল। ফাইনাল খেলবে ওরা। তখন বাপজানের সাথে মা আর রানা জীবনে প্রথমবারের মতো ঢাকায় এলো। ওদের সাথে হেডমাস্টার স্যার, শেফালি আপা, হাসমত স্যারও এসেছেন। হাসমত স্যার যেরকম করে উপলব্ধি করছেন, তাতে মনে হচ্ছে মেয়েরা যে ফুটবল খেলতে পারে, এটা তিনি খুব ভাল করেই জানেন। ঢাকায় আসার তিনদিন আগে হাসমত স্যারের ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে। স্যার নাকি তার নাম মাসুদা রেখেছেন। বড় হয়ে পিচ্চি মাসুদা এমন গোল নাকি করবে, সূর্যে পৌঁছে যাবে বল, হাসমত স্যার চোখ বুজলেই নাকি দেখতে পাচ্ছেন সব।

চারপাশে সবাই চিৎকার করছে, 'মেসি মেসি! পিঠিরপুরের মেসি!'
রানাও চোখ বুজলে দেখতে পায় ওর বোন মাসুদা ছুটছে। মাসুদার পায়ে বল। একটু পরেই চারপাশ ভেঙে পড়বে 'গো......ও.....ল' চিৎকারে, সেই চিৎকারে কান ফেটে যেতে পারে সেই ভয় কারোর নেই। রানারও না। ও পাগলের মতো 'গো......ও.....ল' করবে। সত্যি বলতে কি, আনন্দে ওর পাগল হয়ে যেতেই ইচ্ছে করবে।

মাসুদার পায়ে যেন বল ছুটিয়ে নিয়ে যায় রানা আর মাসুদার বা'জানও। ছোটবেলায় স্কুলের মাঠে ছেলেদের ফুটবল খেলতে দেখতেন। মাঠে নেমে পড়তে ইচ্ছে হ'ত খুব। মাঠে তিনি নেমেছেন, মাসুদার শরীরে নিজের আত্মাটাকে পুরে দিয়ে ঐ যে নেমেছেন মাঠে। ঐ যে তিনি ছুটছেন। ঐ যে তিনি গোল করলেন। গোলপোস্টে আটকে যাওয়া বলটাকে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চোখ আর দেখতে পায়নি। তবে 'গো......ও.....ল' চিৎকার কানে এসে বুঝলেন, গোল তিনি করেছেন।

লেখক : শিশুসাহিত্যিক

Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib Goldcup Football Tournament: Government's step to protect girls' right

Ishrat Nasima Habib

Achievements in empowerment, freedom & rights of women in Bangladesh have highly been praised all over the world which unveiled the truth to the global community that our country is stepping towards development. According to the 'Vision 2041' Bangladesh will cross the boundary of middle income country and enter into the first world in 2041. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman wanted to build his 'Shopner Sonar Bangla' and it was he who understood the reality of a war ravaged country and took initiatives for women education & empowerment. His beloved wife Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib was the main inspiration for taking political challenges for the greater interest of the country and nation. In the stormy life of Bangabandhu the sacrifices and dedication of Bangamata were commandable. They were like flora & fauna of Bangladesh.

They were like the brightest sun & mildest moon of the nature. Our children, the future of our nation must know stories of their glorious life. They have to follow their philanthropic, altruistic attitude which was taught by the Father of the Nation and Bangamata. The teenagers as well as the youth should also follow the examples set by the greatest Bangalee in Thousand Years' and his wife the great lady of Bangladesh. In order to show respect to them a very special tournament for girls of primary schools has been introduced in 2011 styled as Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib Goldcup Football Tournament. The tournament, which was sown as a tiny seed, has now become a large banyan tree. The reputation of the tournament has been spread both at home and abroad.

The girls of primary schools have proved their power, passion and amazing skills by participating in the Bangamata Goldcup Football Tournament. Besides, they won international trophy. In the Asian Football Confederation Cup for women under 14, they were the finalist women team in Nepal. But because of devastating earthquake the tournament was postponed. This was the first international victory of women team of Bangladesh. Most of the players were ex-student from Kolsindhur Government Primary School, Mymensingh. They are the output of Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib Goldcup Football Tournament where their foundation was laid. Under 14 women team defeated India in Tajikistan by 4-0 goal amid heavy snowfall. They were the best team among the regional Asian countries. Bangladesh's prospective girl players stroked 25 goals in four matches of AFC under fourteen tournament. Adorable little girl Tahura was only 12 years old and recorded 10 goals to her credit.

Our bright girls are like star, they spread sweet fragrance of flowers and sparkling in the dark night ever. Marzia, Krishna Rani, Shamsunnahar and other national players are from

Kolsindur Government Primary School and were born in Dhobaura, Mymensingh. National player Shopna has come from Palichsara Govt Primary School, Rangpur and Anuching Mogini is from Ghagra Govt Primary School, Rangamati. These little tigresses roared in every tournament of Bangamata Goldcup Football. Kolsindur achieved unbeaten championship three times between 2013 and 2015. Super little star Marzia, Krishna, Tahura, Shamsunnahar, Maria Manda, Sheuli, Sanjeeda and other players from Kolsindur are playing rhythmic football in AFC cup under 16. Secondly, they have already completed unbeaten qualifying campaign on their way to 2017 AFC under 16. Bangladeshi women team currently placed eighth best Asian team. These magic girls played such a powerful football demonstrative fabulous performance that captivated the spectators as if they were enjoying football match between German and Argentine teams in Rio de Janeiro. The team defeated 5 countries including Iran, Kyrgyzstan, Chinese Taipei and they became group champion and got ticket to play against South Korea, North Korea, Japan, China, Australia in Thailand in 2017.

Recently in Kanchanjangha Stadium, Shiliguri, Bangladesh Women National Football team became the runner-up in SAAF football. Team leader Sabina excels in football trick against Indian women team. Our passionate girls showed striking control over ball, making dribbling, striking, defending and goal keeping. Goal keeper Taslima's special art of playing reminded us Super Star Colombian Super goalkeeper Higuita's peculiarities.

However, Bangladesh women football team conquered heart of Bangladeshi people and their back to back championship made them princesses of football in Bangladesh. These sweet sixteen under-privileged village girls have overcome roadblocks of the fundamentalists. They crushed all prejudice and stigma and earned pride for their motherland. These amazing girls prove that, girls are not weaker than boys. Sabina, Krishna, Tahura, Nargis Khatun, Shopna, Anuching Mogini, Marzia Akhter, Maria Manda all are patriots. They fought for the women of Bangladesh. They are the instances and inspirations for all Bangladeshi women in empowering themselves. They fought to fulfil the dream of Bangabandhu.

The rainy cloud is still over whelming the sky. Social taboos are creating obstacles against women empowerment. However, the Government steps to ensure that girls participate in both sports and education. Bangabandhu Goldcup Primary School Football tournament was started in 2010. In the year 2011, Bangamata Begum Fazilatunnessa Mujib Goldcup Primary School Football tournament was started to ensure the equal right of both girls and boys. Prime Minister Sheikh Hasina got recognition on September 8 in 2014 from UNESCO for her tireless efforts to promote female education in Bangladesh and UNESCO Director General Irina Bokova presented 'Peace Tree' to the Prime Minister.

We believe that in the future our girls will play in the World Cup football tournament. At the same time the community will help to protect the girls rights. The woods will excite in joy and that same cloud will bring floods of pleasure, jingling rhythm, heavenly tune of melody and flow of music. One day this cloud will discover itself lying all white and frozen on top-peak of Himalayas.

Writer: Assistant District Primary Education Officer

ম্যাগনোলিয়া

নাজনীন সাথী

গ্রীষ্মের ছুটিতে নানাবাড়ি যাচ্ছে জয়া। সঙ্গে মা ও দুই ভাই। গোরুরগাড়ির পিছনে পা ঝুলিয়ে বসেছে সে। মাঝে মাঝে খুশিতে পা দোলাচ্ছে। ভাইরা গাড়োয়ানের সঙ্গে সামনে। মা আর খোকন গাড়ির ছইয়ের ভিতর বসেছে। ঠিক আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে কবিতায় আঁকা ছবির মতো গোরুরগাড়িটিও যেন আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কী এক ভালো লাগা অনুভূতি। জয়ার অদ্ভুত লাগছে! খোলা হাওয়া বইছে। সবুজ আর সবুজে ঢাকা গ্রাম। এ যেন শিল্পীর আঁকা কোনো ছবি। সব সবুজ ঢেলে দিয়েছে যেন ছবিতে। জয়ার পছন্দ সবুজ আর কমলা রং। কালো একদম পছন্দ নয়। একটা নীল পাখি চোখে পড়ল জয়ার। রাস্তার পাশে শিরীষ গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসেছে। বক আর ঘুঘুও দেখা মিলছে। শালিক চড়ুইসহ নাম না জানা পাখির কাকলি– কী কথা বলে তারা? যদি বুঝা যেত? জয়া ভাবে আর মনে মনে হাসে।

এবার ক্লাস ফাইভে উঠল জয়া। ঢাকার আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে সে। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই তার খুব ভালো লাগে। বাবা প্রায়ই তাকে বই এনে দেয়। বাবা বলে, শুধু পাঠ্যবই পড়লে হবে কেন? পৃথিবীতে কত কী জানার আছে, সেসব জানতে হলে প্রচুর বই পড়তে হবে। বলো তো মানুষ কীসে বড় হয়? জ্ঞানে, জয়া মাথা দুলিয়ে বলে। বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেয়।

জয়ার সবচেয়ে ভালো লাগে গ্রাম। গ্রামীণ দৃশ্যপট। শহরে থাকে অথচ শহর মন টানে না কেন? কিন্তু তার মামাতো বোন পিয়ার নাকি শহর খুব ভালো লাগে। ও যখন ছুটিতে ঢাকায় ফুফুর বাসায় আসে তখন শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর এসব দেখে আর হোটেল রেস্টুরেন্টে খেতে ভালোবাসে। কারো সাথে দেখা হলে শুধু এসবের গল্প করে। পিয়া জয়ার চেয়ে এক বছরের বড় কিন্তু জয়ার মতোই ক্লাস ফাইভে পড়ে।

গরুগাড়ি চলছে ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে। দু'দিন পর ছোটমামার বিয়ে। বিয়ের জন্যেই জয়ারা নানাবাড়ি যাচ্ছে। ঐতো বড় আম গাছটা দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই পৌঁছে যাবে। পিয়া, তমা, বাবু, শিল্পী, জলি সবাই দৌড়ে আসবে। মার কাছে শুনেছে এক সময় বড়বাড়ি, দালান-কোঠা, পুকুর-ঘাট আর বাগানের জন্যে বিখ্যাত ছিল নানাবাড়ি। মা'র দাদু নাকি খুব সৌখিন ছিলেন। তিনি বলতেন– 'মানুষ তো আর পশু-পাখি নয় শুধু খেয়ে-দেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা জন্ম দিয়ে মরে যাবে। বাঁচা চাই মানুষের মতো।' খুব শখ করে কলকাতা থেকে 'ম্যাগনোলিয়া' ফুলের চারা এনে লাগিয়েছিলেন। গতবার জুয়েল ভাই একটা ফুল পেড়ে দিয়েছিল। পদ্মফুলের মত আকার কিন্তু রংটা কেমন ফিকে, আর কি মিষ্টি সুবাস!

গোরুরগাড়ি বাড়িতে ঢোকার আগেই পিয়া দৌড়ে এসে গাড়ির পিছনে ঝুলতে লাগল, সঙ্গে অন্যরাও। বাড়ির উঠোনে এসে সবাই টুপটাপ নেমে পড়ল।

– কিরে! কেমন আছিস পিয়া? জয়া জানতে চাইল।
– ভাল আছি। তোদের জন্য কখন থেকে আমরা গাছতলায় বসে আছি।
– কিরে তমা, তুই চুপচাপ কেন?
– আমার দাঁতে ব্যথা জয়া আপু। দেখো না গাল ফুলে গেছে। তমা ফুফুকে বলল, 'ফুফু তোমরা খুশাকে আনোনি কেন?'
– আমাদের কাউকে বুঝি ভাল লাগলো না? পলাশ ভাইয়ের কথায় লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো তমার মুখ। মাথা নিচু করে বলল, 'তোমরা সবাই এলে, খুশা নেইতো তাই।'

– পলাশ ভাই জয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাবার অফিসে কাজ অনেক। বিয়ের দিন আসবে। আর তোর জন্যে লাড্ডু নিয়ে আসবে। লাড্ডু তোর খুব প্রিয় কিনা। সবাই হেসে উঠল। পিয়া বলল, 'মিষ্টি খেয়ে খেয়েই তো ওর দাঁতের এ অবস্থা।' ততক্ষণে মামা-মামী, নানী সবাই উঠোনে এসে ভিড় করেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে জয়া আর পিয়া স্কুলের মাঠে যায়। মহিমা রঞ্জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কী সুন্দর স্কুল! বড় খেলার মাঠ। পাশে বিরাট পুকুর মাছেরা খেলা করছে। পিয়া খেলার সাথীদের সাথে জয়ার পরিচয় করিয়ে দেয়। ওরা একসাথে কত কী খেলে তারপর বাড়ি ফেরে।
রাতে যখন ঘুমালো জয়া দেখে সে পিয়াদের সাথে তাদের স্কুলে পড়ছে। ক্লাসে আপার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। আপা তো অবাক! তুমি এতো সব জানলে কীভাবে? জয়া বলে, 'আমি যে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও অনেক বই পড়ি। বাবা আমাকে বই কিনে দেয়। ক্লাসের সব ছেলে-মেয়ে তাকিয়ে আছে জয়ার দিকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ইস্ স্বপ্নটা যদি সত্যি হতো! জয়া ভাবতে থাকে।

সকালবেলা মুখ ধুতে পুকুর ঘাটে যায় জয়া। স্বচ্ছ পানিতে নিজের ছবি দেখে খুব ভালো লাগে। ঘাট থেকে ফেরার পথে জয়া দেখে কাঠগোলাপের কলটি ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। বুড়ো গাছটির মাথায় ফুল আর ফুল। অনেকদিন আগে শ্যামলা রঙের কাজল চোখের একটি মেয়ে জন্মেছিল এ গ্রামে। মাত্র ক'দিনের জ্বরে অকালে ঝরে পড়েছিল কাঠগোলাপের মতো। জয়া চুপচাপ পাখিখালার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। মনটা হু হু করে উঠে। মনে হয়, খালার মত আমিও যদি মরে যাই? পিয়া দৌড়াতে দৌড়াতে এদিকে এগিয়ে আসছে আর চিৎকার করে বলছে– 'গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। তুই এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছিস? চলো তাড়াতাড়ি যাই।' ওরা বাড়ির দিকে এগোয়। দূর থেকে ভেসে আসছে উৎসবের গুঞ্জন...

জানালার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছ। থোকা থোকা লাল ফুল ফুটেছে। বাইরে খাঁ খাঁ রোদ। মনটা হু হু করে উঠে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে জয়া। অনেক দিন হল। মনটা ভীষণ খারাপ। জ্বর একটু কমলেও শরীরটা খুব দুর্বল। মা বলেছে পিং, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত দিবে। কতদিন ভাত খায়নি। খুধ, বার্লি এসব খেতে খেতে তেতো হয়ে গেছে। বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখে ওর প্রিয় পত্রিকা 'কিশোর বাংলা' রাখা। জ্বরের তীব্রতা কমার পর 'কিশোর বাংলা'র কথা মনে পড়ে। একটা ধারাবাহিক গল্প পড়ে আসছিল। তিন সপ্তাহ তো কোন কিছুই পড়া হয়নি। ভাইয়া জয়ার প্রিয় সোনালতা একটা গ্লাসে করে এনে রেখেছে। মা পাশে বসে আছে। উঠার চেষ্টা করতেই মা এসে বসিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আসল। ডাক্তার তার বড় ভাইয়ের বন্ধু তুষার ভাইয়ার বাবা। জয়া চাচ্চু বলে ডাকে।
– কী বুড়ী, আজ কেমন লাগছে?
– আজ একটু ভালো লাগছে চাচ্চু।
– তোমার 'কিশোর বাংলা হাজির দেখেছো তো? জ্বরের ঘোরে প্রায়ই বলতে। তাই মা তোমার জন্যে এনে রেখেছে।
ভাইয়া আসছে। হাতে কি যেন। খাবার-দাবার হবে হয়তো। – হ্যারে ভাইয়া নানা বাড়িতে আমার জ্বরের কথা লিখেছিস? মেজমামা তো তোকে দেখে গেলো। তুই দেখনি কি করে? তুই তো জ্বরে বেহুশ।
– আচ্ছা পিয়া আসতে পারল না?
– ভালো হয়ে তুই ওকে দেখতে যাস।
বলতে বলতে বাইরের বারান্দায় চলে যায়। পাশের ওয়ার্ড থেকে বাচ্চার চিৎকার ভেসে আসছে। ডাক্তার চাচু খোঁজ খবর নিয়ে চলে গেলেন।

'কিশোর বাংলা'র পাতা উল্টাতে গিয়ে তুষার ভাইয়ের কথা মনে পড়ল জয়ার। স্কুলের পাশেই একটা পুরাতন বাড়িতে তুষার ভাইয়া থাকত। বাড়ির সামনে বিশাল লম্বা একটা ইউক্যালিপটাস গাছ, কি সাদা গাছের শরীরটা। স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রায় ইউক্যালিপটাসের পাতা আর ফল নিয়ে আসতো। পাতার কী মিষ্টি গন্ধ, আর ফলগুলো বুড়ো আঙুলের মাথায় ঢুকিয়ে মেঝেতে ছেড়ে দিলে লাটিমের মতো ঘুরতো। সেবার শীতে পিয়া, রুমা মামার সাথে বেড়াতে এসে অনেক ফল কুড়িয়েছিল। তুষার ভাই বলত– 'ফিরে পাতা কুড়ানির দল– পাতা নিলে পয়সা দিতে হবে........।'

তুষার ভাই দুষ্টুমি করলেও মাঝে মাঝে চাচু না থাকলে মোটর সাইকেল চড়াতো। সেবার পিয়াকেও চড়িয়েছিল। সুন্দর ছবিওয়ালা গল্পের বই দিত। আর চকলেট তো ছিলই।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে বাসায় কেউ নেই। পাশের বাসার আন্টি চাবি দিয়ে বলল, সবাই হাসপাতালে। পরে জয়া সব শুনেছিল। ডাক্তার চাচুর নিষেধ ছিল মোটর সাইকেল চালানো। দুপুরে চাচু ঘুমালে তুষার ভাই মোটর সাইকেলের চাবি নিয়ে বেরিয়েছিল। একটু একটু বৃষ্টি ছিল। হেলমেট নিতে গেলে যদি টের পায় তাই নিতে পারেনি। শহর পেরিয়ে খানিকটা দূরে উঁচু রাস্তায় ব্রেক ফেল করে গাড়িটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে শূন্যে চক্কর দিয়ে পড়ে যায়। রাস্তার পাশেই ছোট্ট ঘরের ভেতর থেকে শব্দ শুনে এক মহিলা বেরিয়ে আসে। বৃষ্টির দিন, লোকজন কম ছিল যারা ছিল কিছু দিতে চাচ্ছিল না। মহিলা একটা ভ্যান থামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পরে মোটর সাইকেলের নাম্বার মিলিয়ে লাইসেন্স অফিস থেকে ফোন করে জানানো হয়েছিল বাসায়। সবাই ডাক্তার চাচুকে হাত ধরে নিতে চাচ্ছিল কিন্তু তিনি সব ঠেলে গিয়েছিলেন- 'আমি ডাক্তার। আপনারা সরে দাঁড়ান। হয় মৃত নয় জীবিত, আমাকে সনাক্ত করতে দিন। এটা আমার কর্তব্য।

জয়ার মাকে ডাক্তার চাচু নিজে ফোন করে বলেছিলেন- 'তুষার নেই, এক্সিডেন্ট করেছে। আপনারা এসে ওর মাকে সামলান।' জয়া বসে বসে এসব ভাবছিল। চাচু কি কেঁদেছে? বড়রা সবাই কাঁদতে পারে না কিন্তু জয়ার বাবাই কেঁদেছিল বেশি, সহ্য করতে পারেনি। ইউক্যালিপটাস গাছটা দেখলে তুষার ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মনে হয় তুষার ভাই যেন বলছে-'কিরে জয়া পাকাবুড়ি।' অলক্ষ্যে চোখের কোণে পানি চলে আসে জয়ার।
মা এসে মাথায় হাত রাখে, 'কি ব্যাপার খারাপ লাগছে? মাথা নেড়ে জবাব দেয়, না। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

হাসপাতালে মেজ মামা-মামী আসে। মামী ওকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। অমাও কাঁদছে। কিন্তু শিয়া, শিয়া কোথায়? শিয়া কি আসেনি? সুস্থ হবার পর বাড়ি এসে ভাইয়া ওকে সব বলেছিল তখন জয়ার মনে পড়েছিল। ছোট মামার হলুদের দিন সবাই যখন পুকুরে নেমেছে শিয়া, জয়াও ছিল। শিয়া সাঁতার জানত। কিন্তু জয়া সাঁতার জানত না।
- চল্ তোকে সাঁতার শেখাই।
- আচ্ছা, চল্।
বিরাট পুকুর এপার ওপার অনেক দূর। হঠাৎ মাঝ পুকুরে এসে জয়া বলে, আমি ডুবে যাচ্ছি।
–আমার হাত ধর। জোরে চেষ্টা কর। একটু পানি না খেলে সাঁতার শেখা যায় না শিয়া এগিয়ে এলো।
জয়া পানি খেয়েছিল, তবে শিয়াকে শক্ত করে দু'হাত দিয়ে ধরেছিল আর কিছু মনে নেই।

পলাশ ভাই সে সময় পুকুর পাড় দিয়ে যাচ্ছিল, কেউ ছিল না। মাঝপুকুরে চুল ভাসতে দেখে লাফিয়ে নামে পুকুরে। দেখে জয়া। উঠিয়ে এনে পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করে। জ্ঞান ফিরলে জয়া বলল, 'শিয়া পুকুরে।' হৈচৈ পড়ে যায় সারা বাড়ি। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি করে। বিরাট পুকুর। মাঝ পুকুরে খানিকটা সটান হয়ে আছে শিয়া। পাড়ে এনে পেটে চাপ দিলে এক ফোঁটাও পানি বেরোয়নি। জয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে, এরপরের কিছু মনে পড়ে না। সুস্থতার পর ভাইয়া যখন জয়াকে সব জানায় তখন জয়া ভাবে, শিয়া পানি খায়নি কেন? ডাক্তার নাকি জানিয়ে ছিল শিয়া হার্ট ফেল করেছিল। সাঁতার জানার পরও শিয়া কিন্তু মরে গেল। আর সাঁতার না জানা জয়া বেঁচে গেল? তবে কি শিয়ার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। এটা কি করে সম্ভব? একটা অপরাধবোধ জয়াকে পেয়ে বসে।

আজ ২০১৭ সাল জয়া মামাবাড়িতে এসেছে। ঘরে বিরাট একটা ছবি জয়া ও শিয়ার। শিয়ার হাতে ম্যাগনোলিয়া। মেজমামা ছবিটা তুলে দিয়েছিলেন। ম্যাগনোলিয়া না শিয়া কার হাসিটা বেশি সুন্দর জয়া জানে না। তবে এটুকু বুঝেছে নশ্বর পৃথিবী থেকে অকালে হারিয়ে গেছে শিয়া। যেমনি হারিয়ে গেছে তুষার ভাই। জয়া জানে তারা আর ফিরে আসবে না কখনোই। কিন্তু শিয়ার কাছে চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবে জয়া। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শিয়াকে জড়িয়ে ধরে যে জয়া ডুবেছিল সে গেলো বেঁচে আর সাঁতার জানা শিয়া জয়াকে বহন করতে যেয়ে হার্টফেল করেছিল পানির অতলে। জীবনের এই নির্মম সত্যটি কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন যেন জয়াকে বয়ে বেড়াতে হবে এটি।

লেখক : গল্পকার

বঙ্গবন্ধু

মোঃ জয়নাল আবেদীন

বিংশশতাব্দীর এক মহাপুরুষ
যার নামে পশ্চিমা শাসক ভীত সন্ত্রস্ত।
৭ই মার্চের ভাষণ
স্বাধীনতার ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু
জেগে উঠল মুক্তিপাগল বাঙালি জনতা।
মাত্র নয় মাসের সংগ্রামে
জন্ম দিল–
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
রইলেন পাকিস্তানের জেলে
প্রাণ দিল লাখো জনতা
একখণ্ড মানচিত্রের জন্য
সাথে লাল সবুজের পতাকা।
মাথা উঁচু করে শক্তপক্ত পদে
জানান দিল নিজস্ব অস্তিত্বের
জন্ম দিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।
মাত্র চার বছরের মাথায়
স্বপরিবারে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু
সাজানো সোনার বাংলা হলো না গড়া
আজও বাঙালি কাঁদে
বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায়
তুমি আছ, শাশ্বত, চিরভাস্বর হৃদয়ে মম।

কবি: প্রধান শিক্ষক
ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সেনানিবাস, ঢাকা

অনুভবে অনুক্ষণ

আফরোজা কণা

আমার ভাবনার কল্পনার স্বপ্নে
তিনি বিচরণ করেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো
তিনি আশির্বাদ করেন দূর আকাশের ওপার থেকে
তিনি আমার মা।
মা, ওগো মা তোমাকে ছেড়ে অসহায়
আমি, আমরা সমগ্র বাংলাদেশ।
তোমার কথা বলে আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
ফসলের সবুজ মাঠ কাঁদে
কাঁদে নদীর জল,
পাহাড়ের কান্নায় শিউরে ওঠে সব বৃক্ষের দল।
তুমি বঙ্গজননী-বঙ্গমাতা
তুমি আমার ভালবাসার কবিতার খাতা।
তুমি নেই যেন কিছু নেই আমার
এটা ভাবতেই হৃদয়ে শোক বয়ে যায় বারবার।
তোমাকে হারিয়ে কষ্ট জীবন
অনুভবে মিশে আছো, থেকো অনুক্ষণ।

কবি: সহকারী শিক্ষক
ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সেনানিবাস, ঢাকা

শিশুর বেড়ে ওঠা : বিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গ

শিশির মল্লিক

শিশুর শারীরিক বিকাশের পর্যায়ে যে চাঞ্চল্য আমরা লক্ষ্য করি তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ছুটোছুটি, লাফ-ঝাঁপ, দুষ্টুমি, হৈ-হুল্লোড় আর হাসাহাসি তার সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ। এই স্বাভাবিকতাও শিশুর জন্যে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। তাই শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্যে পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই-ই চাই। প্রশ্ন হলো, এই পরিবেশ শিশু-কিশোররা কার কাছে চাইবে বা প্রত্যাশা করবে। মা-বাবা কিংবা প্রতিবেশীর কাছেই তো? তারাই তো নিশ্চিত করবেন তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে। ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক পর্যায়ের পাশাপাশি প্রতিবেশীর সহযোগিতাও জরুরি।

সর্বোপরি বিদ্যালয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। এক কথায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদি প্রশ্ন রাখি আমাদের শিশু-কিশোররা কি তা যথাযথভাবে পাচ্ছে? উত্তরে পক্ষে বিপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মত আসতে পারে। যে বিষয় এখানে আলোকপাত করতে চাই আলোচনাকে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বলি, শিশু-কিশোরদের শারীরিক মানসিক বিকাশের অনেকগুলো বিষয় আছে– অন্যতম ৫টি মৌলিক অধিকারের বাইরেও আরো বহু শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে বিনোদন ও খেলাধুলা অন্যতম। সাংস্কৃতিক চর্চাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসবের গুরুত্বও অস্বীকার করি কী করে?

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে পরিবেশ ও আর্থিক সামর্থ্যের প্রশ্নটিও সরাসরি যুক্ত। তাই কোন পরিবার একটি মেটাতে পারলেও আরেকটি মেটাতে পারে না। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে শিশুরা। আবার অনেক মা-বাবার সামর্থ্য থাকলেও সময় দিতে পারে না পেশাগত কারণে। এ সংকটে কম বেশি আমরা ভুগছি। আবার শহর ও গ্রাম দুটো আলাদা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

গ্রামের শিশু-কিশোররা উন্মুক্ত পরিবেশ কিছুটা পেলেও শহরের শিশু-কিশোরদের অবস্থা ভিন্ন। মুক্ত পরিবেশ একেবারে অপ্রতুল। পরিস্থিতি এমনটি দাঁড়ায় যে নিজের ঘরে খেলতে গেলে কিংবা হৈ-হল্লা করলে পাশের বাসা কিংবা নীচতলার প্রতিবেশী এসে কলিংবেল টিপে। তাদের অসুবিধার কথা বলে সাবধান করে দেয়। হাতেগোনা ২/৪টি সরকারি কিংবা বেসরকারি বিদ্যালয়– বিদ্যালয়ের পরিবেশ থাকলেও হাজার হাজার বিদ্যালয় গজিয়েছে যেগুলোয় বিদ্যালয়ের কোন শর্তই মানা হয় না। শিশুরা বাসা থেকে বের হয়ে বিদ্যালয় নামক আরেকটি রুমে আবদ্ধ থাকে সারাদিন। অথচ পুরো জাতিই যেন তাদের ওপর ভর করেছে তোমাদের সেরা হয়ে উঠতে হবে। বিশ্ব জয় করে আনতে হবে।

কিন্তু কীভাবে? কিছু বইয়ের প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে এটা কী সম্ভব? জিপিএ ফাইভ কিংবা গোল্ডেন ফাইভ দিয়ে কি বিশ্ব জয় করা যাবে? আমি নিজে যখন ড্রইং ক্লাসে শিশুদের বলি– আজ তোমরা তোমাদের ইচ্ছেমতো আঁকবে। ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি কিংবা তোমরা এঁকেছো সে সব একেবারেই আঁকা যাবে না। সম্পূর্ণ তোমার দেখা চারপাশ অথবা তোমার কল্পিত কোন ছবি চাই। ৯৯% এর প্রশ্ন– 'স্যার কী আঁকবো?' দেখেছি তারা জানা জিনিসটিই আঁকছে। একে তাদের মানসিক দৈন্যতা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। অথচ তারা রাজধানীর স্বনামধন্য বিদ্যালয়গুলোতেই পড়ছে। যেখানে ১০টা, ১৫/২০টা বই মুখস্থ করে ফেলছে তারা। স্কুল, কোচিং, প্রাইভেট টিউটর, মা-বাবা মিলে সবকিছু তাদের তৈরি করে দিচ্ছে– তারা রেডিমেট পেয়ে অভ্যস্ত।

এটা অভিভাবকরা কেন করছেন? উত্তরটা কী আসতে পারে? হয়তো বলবেন ভালো রেজাল্ট করার জন্যে। ভালো রেজাল্ট কেন করবে? ভালো চাকরি পাবে তাই। অর্থাৎ পুরো ব্যবস্থাটাই আর্থিক সাফল্য লাভকেই টার্গেট করে ফেলেছে। যার পরিণাম আমরা ভোগ করছি– যার জাতীয় পরিচয় 'দুর্নীতি'।

যে কোন উপায়ে আর্থিক সাফল্য লাভ, যে সমাজের উদ্দেশ্য সেখানে নৈতিকতা মূল্যবোধ কিংবা প্রশংসাই যেন হাস্যকর। একজন বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কখনো অন্যায় কিংবা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে–'সমাজের বেশিরভাগ মানুষকেই কি আপনি বোধবুদ্ধিহীন বলবেন? আমি বলবো–'হ্যাঁ। সব মানুষ মিলে যদি দুর্নীতি করে তবে অবশ্যই পুরো জাতিই যে বোধবুদ্ধিহীনতায় ভোগছে তা বলতে অসুবিধা কী?

সেখান থেকে ফিরতে হলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। শিশু-কিশোরসহ তরুণদের শিখাতে হবে যে, নিজের চেয়ে সমষ্টিগত কিংবা সামাজিক স্বার্থ অনেক বড়। অন্যায় করার চেয়ে অন্যায় রোধ করা শ্রেয়। দুর্নীতি করার চেয়ে দুর্নীতি নির্মূল করতে উদ্যোগী হওয়া অনেক বেশি জরুরি। দেশের সম্পদ আমাদের সবার সম্পদ। শিক্ষা শুধু অর্থ উপার্জনের জন্যে নয় সমাজকে সেবা দেওয়ার জন্যে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অপ্রয়োজনীয় নয় বরং মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যেই দরকারি। একজন মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ হবার মতো বড়ো কিংবা গৌরবের আর কিছুই হতে পারে না। যারা এসব শিক্ষা দিবেন তাদেরকেই প্রথমে উল্লিখিত বোধগুলো চর্চা করে উদাহরণ হতে হবে নতুবা নতুন প্রজন্ম তাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন? প্রতিযোগিতা দিয়ে কোন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

এটা কি খুব সহজ কাজ? যারা ইতোমধ্যে দুর্নীতির চক্রে আটকে গেছে তাদের বেরিয়ে আসা কঠিন। তারা তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এভাবে যে, 'আমি না করলে কী হবে? আরেকজন তো করবেই।' তাহলে কি ঘুরে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই? সবকিছুরই উপায় থাকে। শুরুটা করতে হবে কোথা থেকে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। মনোযোগটা কেন্দ্রীভূত করতে হবে শিশু-কিশোরদের মধ্য দিয়েই। তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তারাই আমাদের আশা কিংবা ভরসা।

আমরা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানি যে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ব্যাপক অর্থে শিশু-কিশোরদের যথাযথ বিকাশের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তারপরও মনে হয় জনগণ যদি সচেতন থাকেন সেইসাথে সোচ্চার হন। সব অভিভাবকরা যেখানে যে পরিসরে থাকেন, সোচ্চার হয়ে আওয়াজ তুলেন কর্তৃপক্ষ শুনতে বাধ্য। জনতা যখন ক্ষিপ্ত, কর্তৃপক্ষ তখন দুশ্চিন্তায় থাকেন এটাই বাস্তবতা। তারা তো সরকারি সুযোগ-সুবিধার মধ্যেই থাকেন। তাদের অসুবিধা কী?

তবে বলবান পাথরের মতো নিভৃতে কাজ করে যান কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। নাম উল্লেখ না করে বলি তাদের সক্রিয়তার কারণে ঘুটঘুটে অংশে আলোকিত থাকেন– আশার আলোটি মিটিমিটি করে জ্বলতে থাকে। আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশে এরকম বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিভৃতে কাজ করে এসেছে। যার সকল শত বিপত্তিতেও আজকের যে উত্থান ও অগ্রগতি চোখে পড়ে তার পিছনে নেতৃত্বদানকারী অনেকেই এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পেয়েছেন। আমি বলতে চাচ্ছি, সামাজিক সাংস্কৃতিক কিংবা সাংগঠনিক চর্চা ছাড়া নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। অথচ ৮০ দশক থেকেই মধ্যবিত্তের মনে এ স্বপ্ন দানা বেঁধেছে যে, দেশ তো স্বাধীন হলো, এখন আর এসবের দরকার কী? ভালো রেজাল্ট থাকো, মন দিয়ে পড়ো, আর্থিক উন্নতি করো। এ দৌড়ে আজ আমরা কোথায় এসে ঠেকেছি তা সবারই জানা। এ অবস্থার উত্তরণ চাইছে দেশের জন মানুষ।

আসলে রীতিমতো শঙ্কা জাগে যে ঢাকা শহরে যেখানে কোটি ঊর্ধ্ব নাগরিকের বাস সেখানে খেলার কোন মাঠ নেই বললেই চলে। যা আছে তাতেও দেখা যাবে খেলাধুলা করার শিশু-কিশোরদের অনাকুলতা। কারণ একটাই– লেখাপড়ার জন্যে বিদ্যালয় ও পারিবারিক চাপ। অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপলব্ধিই করেন না যে লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলার গুরুত্ব কোনভাবেই কম নয়। দুটোই একে অন্যের পরিপূরক। এ ক্ষেত্রে দুটোই বাধ্যতামূলক করা দরকার। ফলে শারীরিক সামর্থ্যের পাশাপাশি মানসিক সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাবে নিশ্চিত। শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণেও খেলাধুলা খুবই বড় ভূমিকা রাখে। প্রাণোচ্ছলতা ও সক্রিয় রাখতে এর চেয়ে ইতিবাচক আর কী হতে পারে?

আমরা এমন বাংলাদেশ কবে দেখতে পারো জানি না। তবে এ বিষয়ে জনসচেতনতা ও তাদের সক্রিয়তা অসম্ভবকে সম্ভবের দিকে ত্বরান্বিত করবে এ প্রত্যাশা আমরা করতেই পারি। যখন আমরা মানুষ হিসেবে সর্বোপরি জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত হবো সম্মানে ও মর্যাদায়...।

লেখক : চিত্রশিল্পী ও মানবাধিকার কর্মী

মাটি ও মানুষ

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

রাষ্ট্রপতির কাছে টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিবেন। রাষ্ট্রপতির কাছে এমনই একটি আবদার সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের। দরখাস্তটি পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, আমি যাব। ওঁদের সঙ্গে সরাসরি দেখা করব।

একদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কবি রফিক আজাদের সঙ্গে দেখা। তিনিও বড় বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। টগবগে তরুণ। কবিতা লিখে দেশ কাঁপান। কবিতার এতো ধার। পাকিস্তানিরা তাঁর কবিতার অবজ্ঞা শুনে ছটফট করে। দুজন তো আবারই দেখা। থাক সেকথা।

রাসেল সব সময়ই আছে ভুল ধরে। বাবা যেখানেই যায় সেখানেই যাওয়া চাই। আগেই জামা-কাপড় রেডি। কাছে গিয়ে কানে কানে বলে, আমিও যাব।

বাবা হাসেন। তুমিও যাবা? তাহলে চলো।

মা বলেন, সব জায়গায় তোমার যাওয়া লাগে কেন?

রাসেল বাবার অন্যপাশে গিয়ে বাবার কানে কানে বলে, আম্মা যাইতে না করে।

বাবা আবার হাসেন। না, করবে না। চলো আমার সঙ্গে।

একদিন ভোর বেলায় রাষ্ট্রপতির গাড়ি রওনা হয়েছে। টাঙ্গাইল যাবে। রাষ্ট্রপতির সফর সঙ্গী অনেক মানুষ। বিশ-ত্রিশ তো হবেই। রাসেল বাবার পাশে। তাঁর সামনে একজন স্পেশাল গার্ড। পিছনেও দুজন। সামনের গাড়ি থেকে পোঁ পোঁ বাঁশির শব্দ। সমস্ত রাস্তা ফাঁকা। রাসেল বাবার কানে কানে বলে, মানুষ তোমাকে ডরায়?

বাবা হাসেন? না, ডরায় না। কেন বল তো রে বাবু?

বাবার হাসি পায় বটে, আবার জানার কৌতূহলও হয়। শিশুমনের কী ভাবনা তা যাচাই করে যে দেখতেই হয়।

রাসেল বলল, রাস্তা ফাঁকা করে মানুষ পলাইছে?

বাবা বললেন, ও, আচ্ছা! বাবা আবার হো হো হো করে হাসেন। বললেন, মানুষ পালায়নি। নিরাপত্তার জন্য রাস্তা ফাঁকা করতে হয়।

রাস্তাঘাট ভাঙা। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি নিজের চোখে দেখছেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানিরা কীভাবে একটা সোনার দেশকে ধ্বংস করে গেল। তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। অন্তরাত্মায় কান্না শুরু হয়। মুহূর্তে বাবা গম্ভীর হয়ে যাওয়াতে রাসেল চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবে বাবার এমন মুড অফ থাকলে কেউই কথা বলেনি। রাসেলও বলেনি।

সকাল দশটায় বঙ্গবন্ধুর গাড়ির বহর পৌঁছে গেল মধুপুর গড়ের ভিতর। মুক্তিযোদ্ধারা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। কাদের সিদ্দিকী এগিয়ে এসে স্যালুট দিলেন। তিনি আইন-কানুন মেনে অস্ত্র জমা দিলেন।

সবার অস্ত্র জমা দেওয়ার পর এবার বিদায়ের পালা। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন, অরে কাইয়ুম, তুই এসে যা। মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম হতভম্ব। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু আমাকে নাম ধরে ডাকলেন। তার আশপাশের সবাই স্তম্ভিত।

ব্যাপার কী? রাষ্ট্রপতি কীভাবে কাইয়ুমকে চিনেন?

কাইয়ুম উচ্ছসিত। বিনম্র শ্রদ্ধায় সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধুও বললেন, তুইও যুদ্ধ করেছিস?

জি স্যার। আপনার ডাকে যুদ্ধ না করে কি পারবো?

রাসেল পাশেই দাঁড়িয়েছিল। দুজনের এমন অন্তরঙ্গ কথা শুনে একবার বাবার মুখের দিকে আরেকবার মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুমের দিকে তাকায়। মনে মনে বলে, এতো মানুষকে আব্বা চিনেন।

মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুমের চোখ দুটি আনন্দে ছলছল করছে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, লেখাপড়া কি করছিলি? নাকি ছাইড়্যা দিছিলি?

না, স্যার। আমি এম.এ পাশ করেছি।

বাহ, খুব খুশি হলাম।

তোর মা ভালো আছে?

স্যার, মা মারা গেছে।

আচ্ছা। যা। খুশি হইলাম। বাসায় আসিস।

মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম বঙ্গবন্ধুর কদমবুচি করে ফিরে আসে। তার বন্ধুরা ঘিরে ধরল, তোর নাম কীভাবে তিনি জানেন। খুলে বল।

মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম বন্ধুদেরকে বললেন, তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি একদিন আমাদের এলাকায় এসেছিলেন পাটের উৎপাদন দেখার জন্য। তারপর হঠাৎ করেই কোনো নির্ধারিত কর্মসূচি ছাড়াই আমাদের স্কুলে ঢুকে গেলেন।

আমরা সবাই বড় রুমে বসেছি ওনার কথা শোনার জন্য। তিনি কিছু কথাবার্তা বলে আমাদের স্কুলের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, তোমার মন খারাপ কেন? আমি তখন কেঁদে ফেললাম।

তখন স্যার বলেছিলেন, ছেলেটির বাবা মারা গেছে কয়েকদিন আগে। এখন ওর মা খুব গরিব মানুষ। বড় কষ্টে দিন যায়। এজন্য হয়তো কাঁদছে।

স্যারের কথা শোনার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, ওর বেতন মাফ করে দিবেন। আর ওর লেখাপড়ার দায়িত্ব আমার ওপর রইল। আমি মেট্রিক পর্যন্ত ওর লেখাপড়ার খরচ চালাব। তখন থেকেই তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন।

এক বন্ধু বলল, তুই তো তখন ছোট ছিলি। তোর চেহারা চিনল কেমন করে?

কাইয়ুম বললেন, মেট্রিক পাস করার পর আমি একদিন ওনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এরপর আর দেখা নাই। ওনার স্মৃতিশক্তি খুব বেশি। একবার কারো সঙ্গে দেখা হলে দশ বছর পরও তাকে নাম ধরে ডাকেন।

মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুমের কথা শুনে সবাই হতভম্ব। সবার চোখ আনন্দে ছলছল করতে থাকে।

কাইয়ুম বলল, এই নেতা যদি মরার জন্যও ডাক দেন তাহলে না গিয়ে পারা যাবে? যে মানুষটির হৃদয়ে এদেশের মাটি আর মানুষ ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই। তিনি সত্যি মাটি ও মানুষের নেতা। তাই নাম মনে রাখতে পারেন। এমন আর কে আছে বল?

কাইয়ুমের একথা শোনার পর চারপাশে নেমে আসে নীরবতা। তাঁর বন্ধুরা কেউ কোনো কথা বলতে পারেননি।

লেখক : শিশুসাহিত্যিক

গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল

ঊর্মি সিদ্দিকা

ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলে এসে সেই থেকে খোকা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না আমি। রাগে গজ গজ করতে করতে রান্নাঘর, গোয়ালঘর, কাছারি ঘর করছে মা।

-কি হয়েছে খোকার মা?

-কি আর হবে?

-তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি আর পারছি না।

-রোজ একটা না একটা আছে তার।

-আবার কি করেছে?

-কি করে না? কোথাকার কোন পুল ভেঙেছে, তাকে দৌড়ে যেয়ে সেটা সারতে যেতে হবে। যার বাড়িতে যে সমস্যা সেই বাড়িতে তোমার ছেলে গিয়ে হাজির। কাল ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা হয়েছে। সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে রাত জেগে খেলে আসলো।

-ভালো তো!

-পরশু বিকেলে কি কাজ করেছে তুমি তো জানো না! তুমি তো বাড়িতে ঠিকমতো থাকো না। খবরও রাখো না।

-কী? কী করলো আবার?

- বাঁশের পাশে একটা দোয়েলের বাচ্চা পা ভেঙে পড়ে ছিলো। স্কুল থেকে ফেরার পথে সে পাখিটা কোলে করে বাড়ি ফিরে কাকীর কাছ থেকে হলুদ, তেল আর কাপড় নিয়ে সেই পা বেঁধে সারা দুপুর বুকে করে ঘুরেছে। দুপুরে খেয়েছেও পাখিটাকে কোলে করে। বিকালে খেলার সাথীরা খেলতে ডাকলে সে পাখিটা খোপে ঢুকিয়ে খেলতে গেছে। মিনু দুষ্টুমী করে দরজা খুলে দিয়েছে, মিঞা বাড়ির বিড়াল এসে সেই পাখি খেয়ে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে সেই বিড়ালের পেছনে ধাওয়া করেছে সারা টুঙ্গিপাড়া। ভাবো অবস্থা!

- বেশ তো। আমার খোকা বড় হয়ে জনদরদী নেতা হবে। যে পশুপাখি ভালোবাসে খোকার মা সেই তো মানুষ ভালোবাসতে পারবে।

খোকা চোখ ডলতে ডলতে বাবা মায়ের কথার মধ্যে হাজির। বাবা জড়িয়ে ধরে খোকাকে বললো চল খেজুরের রস খাইয়ে নিয়ে আসি।

-বাবা, আজ স্কুলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

-ক্যান বাপ?

-আজ স্কুল পরিদর্শনে আসবে।

-কে আসবে?

-এই যে তুমি শোনো নাই, বাংলার বাঘ শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সেরা হোসেন সোহরাওয়ার্দী।

-তাইলে তোমারে আইনা ভুল করলাম।

-না আমি দুইটা চিড়া খাওয়াইয়া চলে যাবো। আজ পরিষ্কার জামা পরে যেতে হবে।

-আচ্ছা! পা চালাইয়া চলো।

স্কুল মাঠে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান শিক্ষক বুঝিয়ে দিচ্ছে, কার কী করতে হবে। কোনো ছেলেমেয়ে যেন বাড়তি কথা না বলে। গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের কিন্তু একটা আলাদা নাম আছে। সবাই যেন মনে রাখে।

-মুজিবুর রহমান তুমি, ফজলুল হক সারকে ফুল দেবে, আর খালেদ তুমি দেবে হোসেন সোহরাওয়ার্দী সারকে। জানো তো ওরা অনেক বড় মানুষ।

-হ্যাঁ স্যার (সবাই একসাথে বলে উঠল)

সবাই এক এক করে ক্লাসে ঢুকল। দুপুর একটার দিকে নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আসলেন। প্রধান শিক্ষকের কথামতো আমাদের সবার প্রিয় খোকা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার বাঘ ফজলুল হককে ফুল দিলেন।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শেষ হলো। স্যারেরা সবাই অতিথিদের এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত যাচ্ছেন। হঠাৎ করে দেখেন গেটের কাছে শেখ মুজিব আরও কয়েকজন তার ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রধান শিক্ষক একটু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার মুজিব, তুমি এখানে কী করো? সরে দাঁড়াও।

স্যার, আমরা অতিথিদের সাথে একটু কথা বলবো?

প্রধান শিক্ষক আরো রেগে গিয়ে বললেন, তোমাদের আবার কি কথা?

নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দী এগিয়ে এসে প্রধান শিক্ষককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বলতে দিন ওদের।

আমাদের খোকা মানে শেখ মুজিব এগিয়ে এসে নেতাদের বুঝিয়ে বললো তাদের একমাত্র ছাত্রাবাসের দুরবস্থার কথা। অনেক দূর থেকে ছাত্ররা এসে কি দুর্ভোগ পোহায়। আর টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে। এমনভাবে সুন্দর করে বুঝিয়ে বললো যে নেতারা অবাক হয়ে গেলেন এই ছোট্ট সাধারণ ছেলেটির কথা আর তার সৎ-সাহস দেখে।

ফজলুল হক এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, তুমি কোন বাড়ির ছেলে বাবা?

শেখ বাড়ির।

অনেক বড় হবে তুমি। অনেক বড় মানুষ হও।

জননেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দী তাকে অনেক দোয়া করলেন। স্কুলের সব শিক্ষক অবাক হয়ে গেল মুজিবের এই সাহস দেখে। তারা এই সমস্যা তবে নেতাদেরকে বলতে পারেনি। তা মুজিব করে দেখাল। স্কুলে, পাড়ায় খেলার মাঠে একবারেই খোকা সাহসের সাথে কাজ করে। মা একটু বকা দিলেও সবাই খোকাকে অনেক আদর করে।

কিছুদিনের মধ্যেই গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে নতুন ছাত্রাবাস তৈরি হলো।

খোকা আবার নতুন উদ্যমে অন্য কোনো ভালো কাজ শুরু করে দিয়েছে।

লেখক : গল্পকার

খোকার আদর্শে গর্বিত বাঙালি

নুরুন নাহার আক্তার (বকুল)

জীবন চলার পথটা স্রোতস্বিনী তটিনীর মতই বহমান। কান্না হাসি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অবগাহনেই জীবনের জয়গান। কখনও চাওয়া-পাওয়াগুলোর হিসেব মিলাতে না পারা, কখনও স্বপ্নগুলো হতাশের সাগরে বিসর্জন দেয়া। কখনও আশাগুলো বিপর্যস্ত, কখনও সুখগুলো বেদনায় ঢাকা। তবুও ভালোলাগা ভালবাসাগুলোকে সম্পূর্ণই ছেড়ে দিয়ে স্থবির নিঃস্বতাটা যে চলে না।

তাই হাজারো মানুষের ভীড়ে খুঁজে বেড়াই তাঁকেই যাঁর মাঝে ভালবাসা আছে, আছে সততা, আছে আত্মবিশ্বাস, আছে ত্যাগ, আছে আদর্শ, আছে স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধন। একজন মানুষ চাইলেই এতগুলো গুণের অধিকারী হতে পারে না। একটু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের মাঝেই এসব খুঁজে পাওয়া যায়। কখন একজন ভালোলাগার মানুষের মাঝে এসব গুণের কোনোটা মিলে, কখনও কিছুটা মিলে না। কিন্তু এসব গুণের পুরোপুরি সম্মিলন যাকে ঘিরে, সেই মানুষটিই আমার ভালোলাগায়-ভালবাসায়, আবেগে-অনুভূতিতে, আদর্শে-অনুরাগে। আমার স্বপ্ন বুননের সাহসিকতার সবটুকুই যেনো তার অনুপ্রেরণায়। মনে প্রাণে যেনতাই খুঁজে বেড়াই সেই মহান মানুষটিকে আর জানাতে চাই আমার এই ভালোলাগার কথা। বলতে চাই- 'খোকা, তুমি আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগে, ভালবাসায় বিরাজমান। যদিও এই খোকা প্রতিটি বাংলামায়ের আদুরে দুলালের প্রতিচ্ছবি, তথাপিও তিনি ত্যাগে-আদর্শে সর্বকালের সেরা বাঙালি।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তার জন্ম। সায়েরা খাতুন আর শেখ লুৎফর রহমানের আদুরে খোকা। জন্মের পর খোকা কাঁদলে লাল হয়ে যেতো, মাথার চুলগুলো খুব খাড়া হতো। প্রতিবেশীরা বলতেন, 'দেখো, এই ছেলেটা আপোসহীন ও জেদী হবে।' হয়েছেও তো। তিনিই হয়ে উঠেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সারাটা জীবন এই খোকাই বাংলার মাটি আর মানুষকে ভালবেসেছেন। প্রেয়সীর ভালবাসা ছেড়ে, সন্তানদের ছেড়ে, আপনজনদের ছেড়ে কারাবরণ করেছেন বারবার। তবুও পাক সেনাদের দাবীর কাছে মাথানত করেননি। কোনো লোভ ও প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখেননি। কেবলই বাংলার মানুষের অধিকারের বাংলার আপামর জনসাধারণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন ভূ-খণ্ড ও স্বাধীন পতাকা। তাই আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে গর্বিত অবস্থানে।

রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাংলা মা-মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁর মত একটি আহ্বান বিশ্বের কোনো বলীয়ান নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ও

আপন স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রতিটি মানুষ মা বাবা ও আত্মীয় স্বজনদের সাহচর্য ভুলে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছে সবুজ প্রান্তর। অর্থাৎ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হল আমাদের স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন অগণিত মুক্তিকামী মানুষ। আপন সম্ভ্রম বিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য ছিল বাংলার মা-বোনেরা।

কারণে অকারণে বার বার কারাবরণ করেছেন আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা তাঁর 'নদীতের জানালা' নামক পুস্তিকায় লিখেছিলেন, আব্বা জেলে থাকাকালীন জন্ম হয় শেখ কামালের। আব্বা যখন কারামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন, কামাল আমাকে বলেছিলো, 'হাসু বু, তোমার আব্বাকে কি আমি আব্বা ডাকবো।' উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডাক নাম 'হাসু'। এ উক্তি থেকে একটা কথাই স্পষ্ট যে, দেশ ও দেশের মানুষের সুখ ও অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে কতোটা আত্মত্যাগ করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে।

খুব ছোট বয়সে চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ চিকিৎসা করাতে হয়েছিল আমাদের খোকাকে। মোটা ফ্রেমের চশমা পরতে হয়েছে, কিন্তু থেমে থাকেনি খোকা। কখনও স্কুলের নানাবিধ সমস্যাদি সমাধানের লক্ষ্যে ছুটেছেন কর্তা ব্যক্তিদের কাছে, কখনও অভাবীর অভাব ঘুচাতে নিজেদের ঘরের গোলা খালি করেছেন। একবারও ভাবেননি, তাঁর ঘরে খাবার রইলো কি না।
১৯৪৭ এ ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলা নামক ভূ-খণ্ডের জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোণঠাসা করে। চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষা- নানাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে প্রতারণা শুরু হয়। বাংলার মানুষ বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হতে লাগলো। এ শোষণ থেকে বাঁচার প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ও ক্রমবিকাশের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।

এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ, স্বায়ত্তশাসনের পথ প্রশস্ত, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সমগ্র বাঙালির প্রাণের দাবি, দুর্বার আন্দোলন আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলকে স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ প্রতিফলিত হয়।

এরপর ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বাংলার খোকার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন, পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব বিলোপ, উভয় অঞ্চলের মধ্যকার বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, বাঙালির স্বাধিকারবোধের পুনঃসংস্থাপন এবং সর্বোপরি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পন্থা সূচিত হয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও জেনারেল ইয়াহিয়া এ গণরায়কে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনকি বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করার সুযোগ না দিয়ে অসহায় বাঙালিদের হত্যার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় এবং শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। এ সময়ই তিনি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন এবং স্বাধীনতার ডাক দেন। এ ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলার সকল শ্রেণির মানুষ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ত্রিশ লক্ষ বাঙালির তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। তাইতো বঙ্গবন্ধু যথার্থই বলেছেন, 'স্বাধীনতার জন্য কোনো জাতি এতো রক্ত দেয়নি। ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই।'

আমরা চাই বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসিকতা আর আত্মত্যাগে গড়ে উঠুক প্রতিটি বাঙালির হৃদয়। বাঙালি জাতি হিসেবে তোমার জাগরণে আমি গর্বভরে স্মরণ করি খোকাকে। তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমার আদর্শ ও প্রেরণার উৎস হয়ে।

লেখক : সহকারী শিক্ষক
১১১নং মতলব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মতলব, চাঁদপুর

ফুটবল

সাজিদুল ইসলাম

বড় হয়ে হব আমি ফুটবল খেলোয়াড়
ফুটবল খেলা দেখতে খুবই মজাদার,
ফুটবল খেলা আমি খুবই ভালোবাসি
চিরদিন এই খেলা আমাদের সাথী।

ফুটবল খেলায় হব চ্যাম্পিয়ন
দর্শক খেলা দেখে আনন্দ পান
দুই দলে থাকে এক রেফারি,
এর সাথে থাকে আরও দুই গোলকি
হাতে পায়ে লাগে বল
হয়ে যায় গোল
এরই নাম হলো ফুটবল।

কবি : সহকারী শিক্ষক
পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়
পিটিআই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬-এর ফিকচার

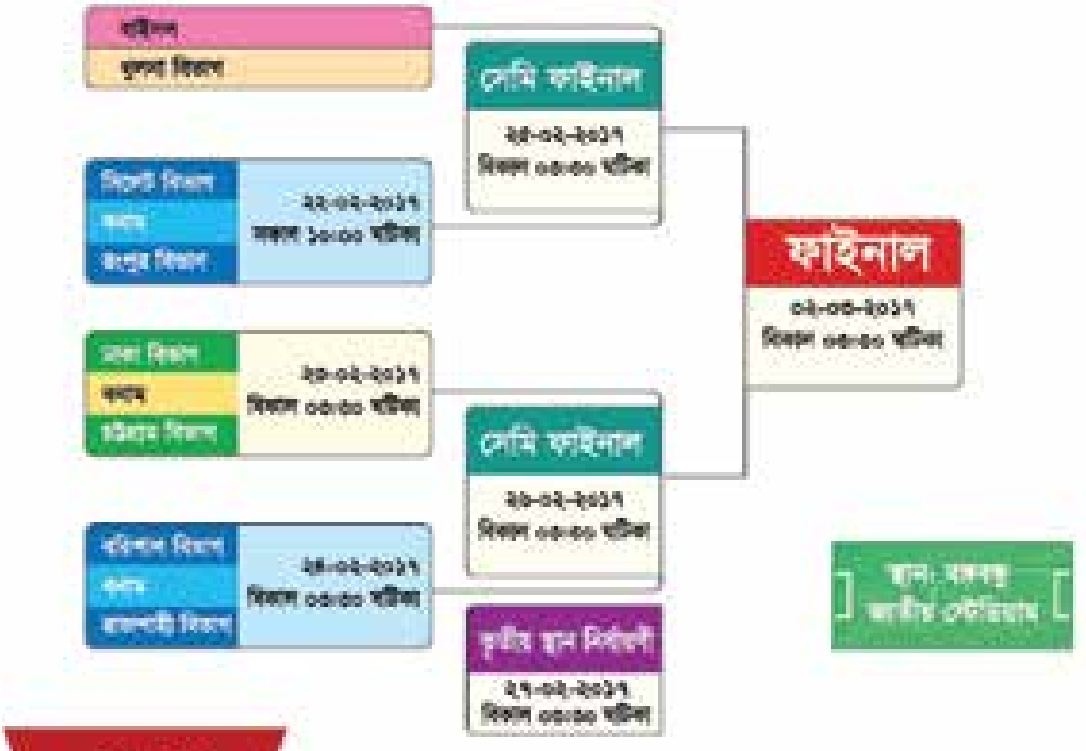

২০১৬-এর অংশগ্রহণকারী দল

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬-এর ফিকচার

২০১৬-এর অংশগ্রহণকারী দল

ফটো গ্যালারি

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৫ এর চূড়ান্ত খেলায় পুরস্কার বিতরণ করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৫ এর চূড়ান্ত খেলায় পুরস্কার বিতরণ করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

খেলুন উঠিয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আলিফ-উজ-জামান, সচিব,
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আবদুল্লাহ-আল-মোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পায়রা উঠিয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আলিফ-উজ-জামান, সচিব,
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আবদুল্লাহ-আল-মোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পতাকা উড্ডিয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আশিক-উজ-জামান, সচিব,
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি,
জনাব মোহাম্মদ আশিক-উজ-জামান, সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

টেপুরবাড়ী বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আনসারকিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, কুড়িগ্রাম এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

দোহারো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরিবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌগাছা, যশোর এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বড়বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আজগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

আলী মিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবন এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

টৈটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাজুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ঝিটি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

উত্তর পূর্ব দাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পশ্চিম গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমতলী, বরগুনা এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সৈয়দ আতহারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, সিলেট এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কামরাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট এর খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি সম্মানিত সচিব, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬ এর খেলার একটি দৃশ্য সিলেট বিভাগ বনাম রংপুর বিভাগ

খেলোয়াড়দের অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

গ্যালারিতে বসে সিলেট বিভাগ বনাম রংপুর বিভাগ এর খেলা উপভোগ করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, জনাব মো: নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খেলোয়াড়দের মাঝে বল বিতরণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, সাথে আছেন
জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, সাথে আছেন
জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল প্রদান করছেন জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি,
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পাশে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের মাঝে জনাব জাহিদ মালেক, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পাশে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের বল বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করছেন জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব আরিফ খান জয়, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ছোট্ট শিশু
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব,
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের হাতে বল বিতরণ করছেন জনাব আরিফ খান জয়, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ভূঞা, পরিচালক, প্রোগ্রাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
জনাব মোহাম্মদ আনিক-উজ-জামান, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ মজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খেলোয়াড়দের মাঝে বল বিতরণ করছে জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ
সাথে আছেন জনাব মোহাম্মদ আনিক-উজ-জামান, সচিব, জনাব মোঃ মজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খেলোয়াড়দের মাঝে বল বিতরণ করছেন জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পাশে আছেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ নিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পাশে আছেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন জনাব মেহবাহ উল আলম, সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আকরাম আল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের সাথে জনাব মেহবাহ উল আলম, সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আকরাম আল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব নাহিদা বেগম, এনডিসি, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহোদয়কে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ছোট্ট শিশু
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব,
জনাব মোঃ শিরাজ উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন জনাব নাহিদা বেগম, এনডিসি, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সাথে আছেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

কোচেস প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০১৮
বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আশিক-উজ-জামান, সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

কোচেস প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০১৮-এ কোচেস প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৯
ফাইনাল আয়োজনের কয়েকটি দৃশ্য

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০১৬-এর ১ম সেমিফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য
খেলায় অংশ নিয়েছে ২০১৬ এর ফাইনালিস্ট দল
কামরাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০১৬-এর ২য় সেমিফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য
খেলায় অংশ নিয়েছে ২০১৬ এর ফাইনালিস্ট দল
টেটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার

বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ২০১৬-এর ১ম সেমিফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য
খেলায় অংশ নিয়েছে ২০১৬ এর ফাইনালিস্ট দল
টেপুরগাড়ী বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ২০১৬-এর ২য় সেমিফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য
খেলায় অংশ নিয়েছে ২০১৬ এর ফাইনালিস্ট দল
বড়বড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী